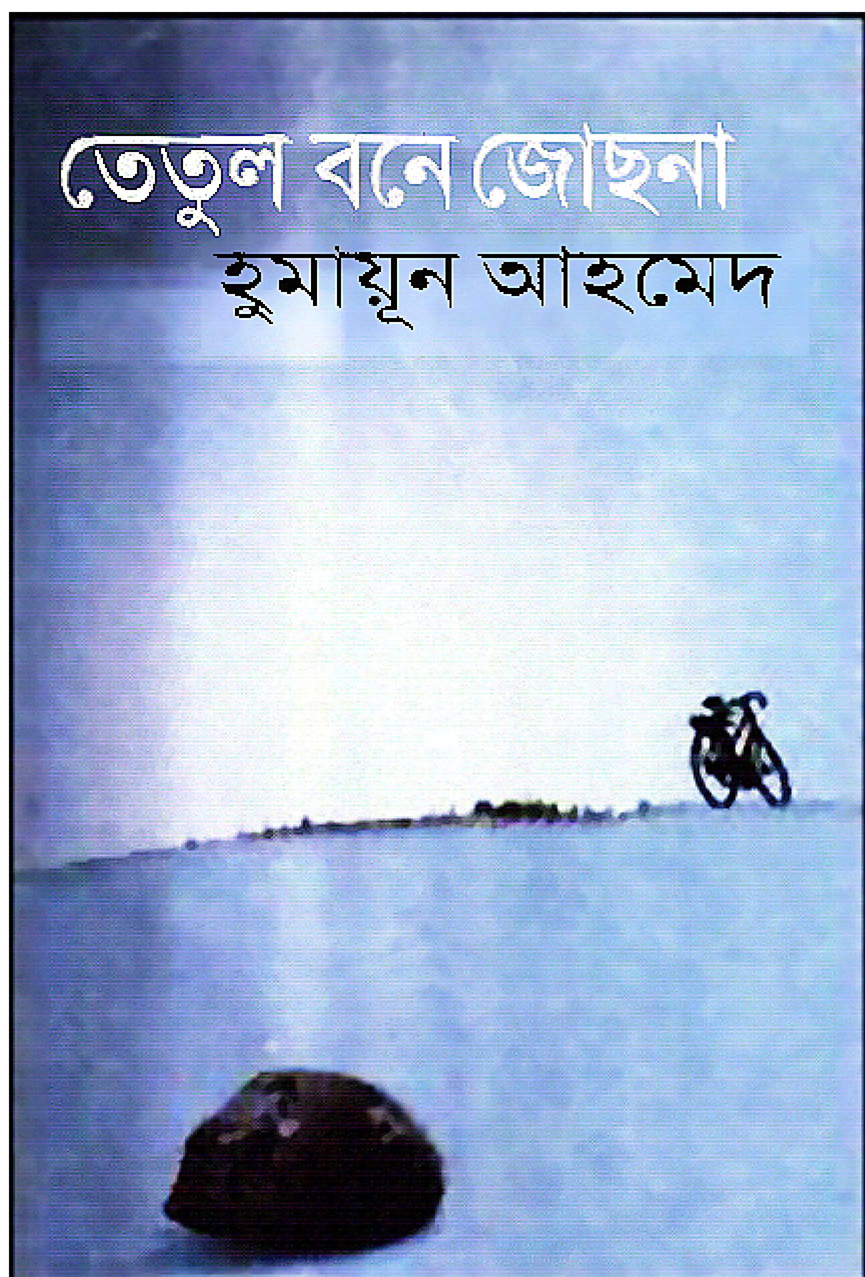

তেতুল বনে জোছনা
হুমায়ূন আহমেদ



সন্ধ্যা তখনো মিলায় নি।

আকাশ মেঘশূন্য, পরিষ্কার। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। প্রথমে কয়েকবার কামানদাগার মতো গুম গুম শব্দ, তারপর কাক ডাকতে শুরু করল। গাছের সব পাখি এক সঙ্গে আকাশে উড়ে গেল। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল বিরাটনগর গ্রামের ওপর দিয়ে। ঝড়ের স্থায়িত্ব দু'তিন মিনিট— এর মধ্যেই গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। প্রকৃতি নানান রকম খেলা খেলে। সে বিরাটনগর নিয়ে মজার কোনো খেলা খেলল। এই খেলার উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় দেখানো না— বিস্মিত করা। যে কারণে কালিমন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া পাঁচ শ' বছরের পুরনো বট গাছ উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল অথচ তার পাশেই রইসুদ্দিনের খড়ের চালা স্পর্শও করল না।

রইসুদ্দিন উঠোনে ধান সিদ্ধ দিচ্ছিল। সে চোখ বড় বড় করে দেখল তার মাথার ওপর দিয়ে আলিশান একটা বট গাছ উড়ে যাচ্ছে। গাছ না, যেন পাখি। শান্ত ভঙ্গিতে উড়ছে।

গ্রামের একটা মানুষও মারা পড়ল না— কিন্তু শত শত পাখি মারা পড়ল। বিরাটনগরের সব ক'টা পুকুরের মাছ এক সঙ্গে ভেসে উঠল। মরে ভেসে ওঠা না, জীবিত অবস্থায় ভেসে ওঠা। যেন দেখতে এসেছে— ঘটনা কী? ঝড় থেমে যাবার পরও সেইসব মাছ ডুবল না, ভেসেই রইল। প্রকৃতির এই খেলা দেখে মাছেরাও যেন অভিভূত। বিরাটনগরের মানুষজনের প্রাথমিক ধাক্কা কাটতেই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাছ মারার সরঞ্জামের খোঁজে। অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা পরে খোঁজা যাবে— আপাতত মাছ মারা যাক। বিরাটনগরে শুরু হলো মাছ মারা উৎসব।

আজকের মাছ মারা অন্যদিনের মতো না। খালি হাতে পুকুরে নেমে পড়লেই হবে। মাছগুলোর স্বভাবে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এদের গায়ে হাত রাখার পরও এরা নড়ছে না। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে না।

মতি মিয়া বড় বাড়ির পুকুরের সামনে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে রইল। তার মাথা ঝিম ঝিম করছে, এ-কী কাণ্ড! বাপের জন্মে সে এমন জিনিস দেখে নাই। লোকগুলোর কাণ্ড দেখেও সে বিস্মিত— কতবড় একটা ঘটনা ঘটেছে, এটা নিয়ে তোরা চিন্তা কর। মাছ মারা বড় হয়ে গেল ? কে জানে হয়তো কেয়ামত শুরু হয়েছে। আছরের ওয়াক্তে কেয়ামত হওয়ার কথা। ঘটনাটা তো বলতে গেলে আছর ওয়াক্তেই ঘটেছে। এই সময় সূর্য পশ্চিম দিকে ডুবতে গিয়েও ডুববে না। উল্টা দিকে ঘোরা শুরু করবে। আর কোনোদিন মাগরেবের ওয়াক্ত আসবে না। মূর্খ গ্রামবাসী মাছ মারা বন্ধ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ ঠিকমতো ডুবে কি ডুবে না। সূর্য না ডুবলে খবর আছে।

মতি পুকুর পাড় থেকে ওঠে গেল। তার বুক ধড়ফড় করছে। বড়ই অশান্তি লাগছে। ঝড়ের সময় কী কী ঘটনা ঘটেছে ভালোমতো জানা দরকার। জুম্মাঘরের টিউবকল থেকে লাল পানি বের হচ্ছে বলে শুনেছে— এটাও দেখা দরকার। কালিমন্দিরের বটগাছ উপড়ে কোথায় নিয়ে ফেলেছে— এই খোঁজটা বের করতে হবে। এতবড় একটা বটগাছ উড়ে আর কতদূর যাবে ? খালপাড়ের সুলেমান নাকি আল্লাহর নামে কীরা কেটে বলেছে— বটগাছ যখন উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন বটগাছে তরুণী একটা মেয়ে পা ভাঁজ করে বসে ছিল। মেয়েটার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। তার জন্য মেয়েটার কোনো লজ্জা শরমও ছিল না। মুখে ছিল হাসি। সুলেমানের কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিছু কিছু লোকের জন্মই হয়েছে মিথ্যা কথা বলার জন্যে। সুলেমান তাদের একজন। তারপরেও সে কী বলতে চায় এটা শোনা দরকার। কঠিন মিথ্যাবাদীও মনের ভুলে দু'একটা সত্য কথা বলে ফেলে। কে জানে সুলেমানের এই কথাটা হয়তো সত্যি।

মরা পাখিগুলো দেখে মতির খুব মায়া লাগছে। ঝড় তুফানের খবর পাখিরা আগে পায়। পাখিদের উচিত ছিল উড়ে পাশের যে-কোনো একটা গ্রামে চলে যাওয়া। পাশের গ্রামগুলোতে কিছুই হয় নি। গাছের একটা পাতাও নড়ে নি। এটাও একটা আচানক ঘটনা। মতি একটা মরা ডাহুক পাখির পাশে বসে পড়ল। ডাহুক পাখির মাংস অতি স্বাদু। ঝড়ে যে পাখি মারা গেছে তার মাংস খাওয়া ঠিক কি-না কে জানে ? মরা মাছ খাওয়া যায়, কিন্তু মরা পাখি কি খাওয়া যায় ? যে-কোনো পাখি মরার সময় পা দু'টা আকাশের দিকে তুলে রাখে। এটাই নিয়ম। কিন্তু এই পাখিগুলো কুঁকড়ে মুকড়ে পড়ে আছে।

নিয়মমতো মরতেও পারে নাই। এটাও একটা আফসোস।

মতি, কী কর ?

বিরাটনগর কম্যুনিটি হেলথ কমপ্লেক্সের ডাক্তার সাহেব সাইকেল হাতে ধরে হেঁটে হেঁটে আসছেন। ডাক্তার সাহেবকে দেখে মতির বুক ধড়াস করে উঠল। গলা খানিকটা শুকিয়ে গেল। এম্নিতে এই ডাক্তার অতি ভালো মানুষ। অতি সজ্জন। নিজ থেকে আগবাড়িয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে। ডাক্তার হিসেবে এক নম্বরেরও ওপরে। কোনো রোগীর বাড়িতে গিয়ে একবার শুধু যদি সাইকেলের ঘণ্টা দেয় তাহলেই ঘটনা ঘটে যায়। ঘণ্টার শব্দ শুনে রুগি বিছানায় উঠে বসে বলে, মুরগির সালুন দিয়ে ভাত খাব। আগের যে দু'জন ডাক্তার ছিল তারা দু'জনই ছিল খচ্চর ধরনের। এর মধ্যে দ্বিতীয় জন ছিল খচ্চরেরও নিচে। তাকে সালাম দিলে সালামও নিত না। সালামের জবাবে মাটির দিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করত। মানুষ হয়ে জন্তুর মতো শব্দ করবে কেন ? তুই কি জন্তু ?

বর্তমান ডাক্তার সাহেবের নাম আনিসুর রহমান ঠাকুর। মুসলমানের নামের শেষে ঠাকুর থাকবে কেন এটা জিজ্ঞেস করা দরকার। মতি ঠিক করে রেখেছে কোনো এক সময় জিজ্ঞেস করবে। এই ডাক্তার সাহেব এত ভালো যে মতি নিশ্চিত ইনি বেশি দিন বিরাটনগরে থাকবেন না। বিরাটনগর এমন একটা জায়গা যেখানে ভালো মানুষ বেশিদিন টিকে না। ডাক্তার সাহেব অতিরিক্ত ভালো মানুষ। এমন ভালো মানুষকে দেখে কারোরই বুক ধড়াস করার কথা না— কিন্তু মতির বুক কাঁপছে। কারণ, সে গত বুধবার সন্ধ্যাকালে ডাক্তার সাহেবের দু'টা শার্ট আর একটা লুঙ্গি চুরি করেছে। ডাক্তার সাহেবের কাজের ছেলে সুজাত মিয়া কাপড় ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছিল। সন্ধ্যা পার হবার পরেও সেই বদছেলে কাপড় ঘরে তুলল না। কাজেই মতি কাপড় ভাঁজ করে তার চাদরের নিচে নিয়ে নিল। কাজটা অন্যায় আবার ঠিক অন্যায়ও না। কাপড় মতি না নিলে অন্য কেউ নিয়ে নিত। বিরাটনগর চোরের জায়গা। সমস্যা হলো ডাক্তার সাহেবের কাপড় এখন পরা যাবে না। দেখেই সবাই চিনে ফেলবে। ডাক্তার সাহেব বদলি হয়ে গেলে সে পরবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, ডাক্তার সাহেব যাবার সময় পেয়ার করে তাকে দিয়ে গেছেন। অবিশ্বাস করার মতো কথা না। ডাক্তার সাহেবের অন্তরে মায়া মহব্বত আছে। পেয়ার করে তিনি মতিকে নিজের কিছু ব্যবহারী কাপড় দিতেই পারেন। ডাক্তার সাহেবের দ্রুত বদলি হয়ে যাওয়াটা মতির জন্যে মঙ্গলজনক।

মতি হাত কচলে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ডাক্তার সাব কেমন আছেন?

ভালো আছি।

কেমন প্রলয় ঘটনা ঘটেছে দেখলেন? আর একটু হলে কিয়ামত হয়ে যেত।

হুঁ।

বাপের জন্মে এই জিনিস দেখি নাই। বটগাছ উড়ায়ে নিয়ে গেছে। বটগাছের কাছে ইয়াছিন মিয়া বইস্যা হুক্কা টানতেছিল। তার কল্কির আগুন পর্যন্ত নিভে নাই। সে এমন ভয় খাইছে। কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে। ছোট নষ্ট না, বড় নষ্ট। লুঙ্গি বরবাদ কেমন আচানক ঘটনা বলেন দেখি?

খুব আচানক না। টর্নেডোতে এমন হয়।

কী কন আপনে?

টর্নেডোর ঠিক মাঝখানে থাকে টর্নেডোর চোখ। এই চোখ যে সব জায়গা দিয়ে যায় তার ব্যাপক ক্ষতি করে কিন্তু আশেপাশে তেমন কিছু হয় না।

পুষ্কুনির সব মাছ ভাইস্যা উঠছে— খবর পাইছেন?

সেটাই দেখতে এসেছিলাম। ইন্টারেস্টিং তো বটেই। এই জিনিস আমি নিজেও আগে কখনো দেখি নি।

মতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, এটা আর কিছু না। এটা আল্লাপাকের ঘণ্টা। আল্লাপাক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি দিয়া আমাদের বলেছেন— বান্দা, সাবধান হও।

আনিস কিছু বলল না। সাইকেল টেনে এগুতে লাগল। তার পেছনে পেছনে আসছে মতি। এটা মোটামুটি একটা দুর্ঘটনা। মতি কথা না বলে থাকতে পারে না। হড়বড় করে কথা সে বলতেই থাকবে। মতির বয়স ত্রিশ। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা। বিরাটনগরে তার একটা চালাঘর আছে তবু রাতে সে ঘুমায় নান্দাইল রোড ইস্টিশনে। একই সঙ্গে সে নানান কাজকর্ম করে, আবার কিছুই করে না। মাঝে মধ্যে কুলির কাজ করে। যাত্রীদের মালামাল নামায়। কিছুদিন গ্রামে এসে থাকে। ঘরামীর কাজ করে। শীতের সিজনে মুড়ি লাড্ডু বানিয়ে ট্রেনে করে বিক্রি করতে চলে যায়— গৌরীপুর-মোহনগঞ্জ। কিছুদিন হলো— সে জ্বরের একটা বড়ি বানানোর চেষ্টা করছে। লালু ফকিরের কাছ থেকে ফর্মুলা জোগাড় হয়েছে। ফর্মুলা মতো বড়ি বানিয়ে রোদে শুকাতে দেবার সময় গণ্ডগোলটা হচ্ছে। একটু শুকালেই বড়ি পাউডারের মতো হয়ে যাচ্ছে। বড়ির নামও মোটামুটি ঠিক করা—

'জ্বরমতি'

নিজের নামটা কায়দা করে বড়ির নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া। যতদিন এই বড়ি থাকবে ততদিন মতির নামও থাকবে। এটা কম কথা না।

বড়ি বানানো হয়ে গেলে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে গৌরীপুর, নেত্রকোনা, শ্যামগঞ্জ এই লাইনে বিক্রি করতে হবে। এই অঞ্চলের লোকদের পেটের ব্যথা বেশি— ট্যাবলেটে চোখের নিমিষে উড়ে যাবে। বিজ্ঞাপনের ভাষাও মোটামুটি ঠিকঠাক—

আসিয়াছে! আসিয়াছে!!

জ্বর নাশক 'জ্বরমতি' বড়ি।

এক বড়ি যেমন তেমন

দুই বড়িতে কাম

ভাই ব্রেদার শুনেন শুনেন

জ্বরমতির নাম।

এই বড়ি স্বপ্নে প্রাপ্ত। বড়ির ক্রয় বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শুধু হাদিয়া বাবদ পাঁচ টাকা।

বড়ি সেবনের পরের সাত দিন গোমাংস ভক্ষণ এবং

স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

গ্যারেন্টিসহ চিকিৎসা। বিফলে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত।

মতির ইচ্ছা বড়ির বিষয়টা নিয়ে ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে। ডাক্তার সাহেব অতি জ্ঞানী মানুষ, তিনি সমস্যার সমাধান জানবেন। বড়িগুলো পাউডার হয়ে যাচ্ছে কেন এটা তিনি কি আর জানবেন না। ডাক্তার মানুষ তাদের কাজ কারবার হলো বড়ি নিয়ে।

ডাক্তার সাব।

হুঁ।

মতি চিন্তিত মুখে ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকাল। সে সামান্য হতাশ বোধ করছে। ডাক্তার সাহেব 'হুঁ' বলা শুরু করেছেন। ডাক্তার সাহেবের এই এক অভ্যাস। একবার 'হুঁ' বলা শুরু করলে— 'হুঁ' বলতেই থাকেন। যাই জিজ্ঞেস করা হোক, উত্তর একটাই— 'হুঁ'।

বড়ই আচানক ঝড় হয়েছে। কি বলেন ?

হুঁ।

পাখি মারা পড়েছে বেশুমার। সব ধরনের পাখি মারা পড়েছে। এর মধ্যে একটা ডাহুক পাখিও দেখলাম।

হুঁ।

ডাহুক পাখির মাংস অতি স্বাদু।

হুঁ।

আপনি ডাহুক পাখির মাংস কোনোদিন খেয়েছেন ?

না। খাই নি।

মতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ডাক্তার সাহেব হুঁ বলা বন্ধ করেছেন। এখন হয়তো কিছু কথাবার্তা বলবেন।

ডাহুক পাখি বছরে একদিন অন্ধ হয়ে যায়— এটা জানেন ?

না।

খুবই আচানক ঘটনা। বছরে একদিন ডাহুক পাখি চোখে দেখে না। ডাহুক পাখি ধরার এই একটাই সুযোগ। ঐ দিনেই ধরা হয়।

ডাক্তার কৌতূহল চোখে তাকাল। একটি বিশেষ শ্রেণীর পাখি বৎসরে একদিন চোখে দেখে না— এটাতো বিস্ময়কর ঘটনা। ঘটনার পেছনে কি সত্যতা আছে ? না-কি এটিও অনেক লোকজ বিশ্বাসের মতো একটি অপরীক্ষিত লোকজ বিশ্বাস ?

ডাক্তার সাব।

বল।

ঝড়ে যেসব পাখি মারা গেছে সেইগুলা খাওয়া কি জায়েজ আছে ?

তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

ধরেন একটা ডাহুক পাখি গাছের আগায় বসে আছে। ছররা গুলি দিয়া তারে মারলাম। এই পাখি খাওয়া জায়েজ আছে। আবার ধরেন ঝড়ে পাখিটা মারা গেল— সেটা খাওয়া কি জায়েজ আছে ?

আমি বলতে পারছি না। তবে আমি কোনো সমস্যা দেখি না।

খাবেন ?

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, কী খাব ?

মতি ইতস্তত করে বলল, বাঁশ ঝাড়ের নিচে একটা ডাহুক পাখি মরে পড়ে আছে। বেশি করে পিঁয়াজ রসুন দিয়ে ঝালঝাল করে রেঁধে নিয়ে আসি ? খান।

আপনে ডাহুক পাখির মাংস খান নাই। খেলে মজা পাবেন। পাখির মাংস শক্ত হয়। ডাহুক পাখির মাংস মোলায়েম। হাড্ডি সুদ্দা মুখের মধ্যে গলে যায়। যদি খান— ব্যবস্থা করি।

না। ডাহুক পাখি খাব না।

আমার কথায় রাগ হয়েছেন ?

না, রাগ হই নি। রাগ হব কেন ?

রাগ হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। এতবড় একটা ঝড় নিজের চউক্ষে দেখার পর থাইক্যা মাথা ঠিক নাই। কী বলতে কী বলি।

ডাক্তার জবাব না দিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ল। মতি ফিরে চলল বাঁশঝাড়ের কাছে। ডাহুক পাখিটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নান্দাইল রোড বাজারের একটা মেয়ে মানুষের কাছে তার যাতায়াত আছে। মেয়ে মানুষটার নাম মর্জিনা। এই মেয়ের খাওয়া খাদ্য খুব পছন্দ। সবসময় তার মুখে কিছু না কিছু আছে। মুখ নড়ছেই— টুকুর টুকুর টুকুর। এক বাটি পাখির মাংস রেঁধে নিয়ে গেলে মর্জিনা বড়ই খুশি হবে। তুফানের গল্পটাও করা দরকার। সামান্য জোড়াতালি দিয়ে সুন্দর করে বলতে হবে। আচানক ঘটনা শুনতে পুরুষ মানুষ তেমন পছন্দ করে না, মেয়ে মানুষ করে। ঝড়ের ঘটনা মতি কীভাবে বলবে মনে মনে গুছাতে শুরু করল—

বুঝলি মর্জিনা— আল্লাপাকের কুদরতির শেষ নাই। পরিষ্কার দিন। নীলা আসমান। হঠাৎ বাজ পড়ার মতো শব্দ। দৌড় দিয়া ঘর থাইক্যা বাইর হইয়া দেখি মাথার ওপর দিয়া উড়াজাহাজের মতো কী জানি যায়। শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ শব্দ। চউখ কচলাইয়া তাকাইলাম— না উড়াজাহাজ না, বটগাছ। বিরাট বটগাছ আমার বাড়ির ওপরে দিয়া উড়াল মাইরা যাইতেছে। ঘটনা এইখানে শেষ না। বটগাছে এক মাইয়্যালোক বসা। পানের বাটার মতো গোল মুখ। ঠোঁট টকটকা লাল। মনে হইতাছে এইমাত্র রক্ত খাইয়া আসছে— ঠোঁটে রক্ত লাইগ্যা আছে। তার পরনে একটা কাপড় দূরের কথা, সুতা পর্যন্ত নাই।

মর্জিনা গল্পটা পুরো বিশ্বাস করবে। মেয়ে মানুষের যে স্বভাব বিশ্বাস করলেও ভাব দেখাবে বিশ্বাস করে নাই। মুখ ঝামটা দিয়ে বলবে, আফনে এমন মিছখোর। খালি মিছা কথা। বটগাছের ওপরে নেংটা মেয়েছেলে। ছিঃ।

মতিকে তখন আল্লাখোদার নামে কীরা কাটতে হবে। এতে কিছু পাপ হবে। কোনো এক জুম্মাবারে মসজিদে গিয়ে তওবা করে পাপ কাটাতে হবে।

ডাক্তার সারাগ্রাম ঘুরে এখন দাঁড়িয়ে আছে মগড়া খালের কাছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলেও এই জায়গায় কী করে জানি খানিকটা আলো আটকে আছে। শীতকালে খালে কোনো পানি থাকে না। এখন আশ্বিন মাস, পায়ের পাতা ডোবার মতো পানি আছে। পাহাড়ি নদীর পানির মতো এই খালের পানি চকচক করছে। মগড়া খাল মূল যে নদী থেকে এসেছে তার পানি ঘোলা অথচ এই খালের পানি সবসময়ই ঝকঝকে পরিষ্কার। দেখলেই আজলা ভর্তি পানি নিয়ে চোখে মুখে দিতে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার জংলী কাঠগোলাপ গাছে হেলান দিয়ে সাইকেলটা রাখল। সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা পেটমোটা চামড়ার ব্যাগ হাতে নিল। মগড়া খালের পাশে সুন্দর বসার ব্যবস্থা আছে। জনৈক বিধুভূষণ চক্রবর্তীর বানানো গোলাকৃতি ঘর। যে ঘরের মেঝে শ্বেতপাথরে বাঁধানো। একসময় মগড়া খাল বিশাল নদী ছিল। তার নাম ছিল হাবলংগ নদী। নদীর তীরে ছিল মহাশ্মশান। দূর দূরান্ত থেকে খাটিয়ায় করে মরা আসত। সেই সময় বিধুভূষণ চক্রবর্তী শ্মশান যাত্রীদের জন্য এই ঘর বানিয়ে দেন। নিজের কর্মকাণ্ডও দেয়ালে লিখে রাখেন—

শ্মশানবন্ধুর কল্যাণ কর্মে
অনাথ কাঙাল বিধুভূষণ চক্রবর্তী
কর্তৃক বঙ্গতারিখ ১৩২০ সনে নির্মিত।
শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিবেক
অন্যথায় মহাপাতকী হইবেন।

দেড়শ বছরে হাবলংগ নদী হেজেমেজে হয়ে গেছে মগড়া খাল। শ্মশানবন্ধুদের কল্যাণকর্মে নির্মিত ঘর ধ্বসে গিয়েছে। উত্তরদিকের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে শ্বেতপাথরের মেঝে অবিকৃত আছে। জোছনার সময় মেঝে থেকে জোছনা ঠিকরে পড়ে। ডাক্তার লোক লাগিয়ে মেঝে পরিষ্কার করিয়েছে। সে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে, যদিও জায়গাটা বিপজ্জনক। গত বৎসর দু'টা গরু এই জায়গায় সাপের কামড়ে মারা গেছে। তার আগের বছর এক ভিখিরিণী মারা গেছে। ভিখিরিণীর পরিচয় উদ্ধার হয় নি। মনে হয় অনেক দূরের কোনো গ্রাম থেকে ভিক্ষা করতে করতে এদিকে চলে এসেছিল। দুপুরে ক্লান্ত হয়ে আঁচল পেতে নির্জন শ্মশান ঘরে শুয়েছিল। সেখানেই তাকে সাপে কাটল।

ডাক্তার চামড়ার ব্যাগ খুলে পেটমোটা একটা শিশি বের করে শিশির মুখ খুলল। ছড়িয়ে পড়ল কার্বলিক এসিডের কড়া গন্ধ। সে যতক্ষণ এখানে থাকে মুখ খোলা অবস্থায় কার্বলিক এসিডের বোতলটা পাশে থাকে। যে-কোনো পুরনো ধ্বংসস্তূপ হলো গোখরা সাপের আস্তানা। প্রচণ্ড বিষধর সাপ ভীরু প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাদের স্বভাব হলো মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকা। এই ক্ষেত্রে মানুষেরও কিছু করণীয় আছে। মানুষদের উচিত তাদের উপস্থিতি জানান দেয়া।

ডাক্তারের চায়ের পিপাসা পেয়েছে। তার পেটমোটা ব্যাগে চায়ের সব সরঞ্জামই আছে। ফ্লাস্ক ভর্তি ফুটন্ত গরম পানি। টি ব্যাগ, চিনি। আল গ্রে চায়ের একটি টিনের কৌটাও আছে। আল গ্রে চায়ের বিশেষ গন্ধটা নবনীর অতি প্রিয়। এই কৌটার মুখ এখনো খোলা হয় নি। সামনের সপ্তাহেই নবনীর আসার কথা। তখন খোলা হবে।

চা বানানোর সরঞ্জাম ব্যাগ থেকে বের করা হয়েছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পরেও জায়গাটা পুরোপুরি অন্ধকার হয় নি। অবশ্যি অন্ধকার হলেও সমস্যা নেই। ব্যাটারিতে চলে এমন একটা ছোট্ট লণ্ঠন ব্যাগে আছে। চা কড়া হয়ে গেছে— তারপরেও চুমুক দিয়ে আনিসের ভালো লাগল। সে ব্যাগের ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। মাস ছয়েক হলো সে সিগারেট ছাড়ার প্রাণপন চেষ্টা করছে। লাভ হচ্ছে না। সিগারেট খাওয়া বরং বেড়ে গেছে। নবনী এলে সিগারেট খাওয়া পুরোপুরি ছাড়তে হবে। নবনী সিগারেটের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তার নাকি সিগারেটের প্যাকেট দেখলেই গন্ধে মাথা ধরে, বমি চলে আসে। গত সপ্তাহে নবনীকে চিঠি লেখা হয় নি। নির্জন জায়গায় বসে চট করে কয়েক লাইনের চিঠি লিখে ফেলা যায়। চিঠির সরঞ্জাম— কাগজ, বলপয়েন্ট, খাম, ডাকটিকিট সবই তার মোটা ব্যাগে আছে। চিঠি লিখবে কি লিখবে না— আনিস মনস্থির করতে পারছে না। তার সিগারেট শেষ হয়েছে, সে আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। চিঠি লেখার পরিকল্পনা আপাতত বাতিল। তবে চিঠির ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মস্তিষ্কের একটা অংশ গুটগুট করে চিঠি লেখা শুরু করে দিয়েছে। আনিস এখন যদি সাইকেলে উঠে রওনা দেয় তবু চিঠি লেখা বন্ধ হবে না।

নবনী,

আমাদের এখানে আজ হঠাৎ করে টর্নেডোর মতো হলো। টর্নেডোর স্থায়িত্ব ছিল কম। দুই থেকে আড়াই

মিনিট হবে। তবে এই কিছুক্ষণেই যা ঘটেছে তার নাম লণ্ডভণ্ড। ছবি তুলে রাখলে তুমি দেখতে পেতে। ফিল্ম ছিল না বলে ছবি তোলা হয় নি। এখানের বাজারে ফিল্ম পাওয়া যায় না। ফিল্মের জন্যে লোক পাঠাতে হয় নেত্রকোনায়। তোমার যদি মনে থাকে তাহলে ফিল্ম নিয়ে এসো। এই অজ অঞ্চলে মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ব্যাপার ঘটে যার ছবি তুলতে ইচ্ছে করে।

আমার খবর ভালো। হাসপাতালে প্রচুর রোগী আসে। তেমন কোনো কারণ ছাড়াই আমার ধন্বন্তরী ডাক্তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। এরা আমার নাম কি দিয়েছে জান? আমার নাম দিয়েছে— 'সাইকেল ডাক্তার'। একটা সাইকেল নিয়ে ঘোরাফেরা করি এই জন্যেই এই নাম। ভাগ্যিস ঘোড়ার পিঠে চড়ি না। চড়লে এরা নাম দিত 'ঘোড়া ডাক্তার'। আমার বিষয়ে যে মজার ব্যাপারটি ছড়িয়েছে সেটা হলো— যখন আমি ভিজিটে যাই এবং রোগীর বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নেমে ঘণ্টা দেই ঠিক তখনি সাইকেলের ঘণ্টা শুনে রোগীর রোগ সেরে যায়। ওষুধপত্র কিছুই লাগে না। আমি খুব ভয়ে ভয়ে আছি— অচিরেই এরা হয়তো আমাকে 'সাইকেল ডাক্তার' ডাকা বন্ধ করে 'ঘণ্টা ডাক্তার' ডাকা শুরু করবে।

তুমি যে চারটা অর্কিড দিয়ে গিয়েছিলে সেইগুলো বারান্দার যে জায়গায় ঝুলাতে বলেছ সেখানেই ঝুলানো হয়েছে। যেভাবে যত্ন করতে বলেছ সেভাবেই যত্ন করছি। তোমার হিসেব মতো গত মাসেই গাছগুলোতে ফুল আসার কথা। এখনো কিন্তু আসে নি। হঠাৎ করে অর্কিডের প্রসঙ্গ কেন এল— বলি। পরশু রাতে স্বপ্নে দেখি গাছগুলোতে ফুল ফুটেছে। স্বপ্নের ফুল বাস্তবের ফুলের চেয়েও সুন্দর হয়। স্বপ্নে দেখলাম গাছগুলোতে শুধু যে নীল রঙের ফুল ফুটেছে তা না। ফুলগুলো চাঁদের জোছনার মতো চারপাশে আলো ছড়াচ্ছে। আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য তোমাকে দেখাবার জন্যে ডাকাডাকি করছি। তুমি যে এখানে থাক না

এটা আমার মনে নেই।

আমার চিঠি পড়ে তোমার কি হাসি পাচ্ছে? মনে হচ্ছে ডাক্তারের ভেতর কাব্য ভাব চলে এসেছে? কিছুটা যে আসে নি তা-না। রোগ শোক ছাড়াও ইদানীং আমি আরো অনেক কিছু নিয়ে ভাবি। কিছু কিছু ভাবনা বেশ উদ্ভট।...

হঠাৎ একসঙ্গে ঝিঁঝি পোকা ডাকতে শুরু করল। লোক বসতির বাইরে যেসব ঝিঁঝি ডাকে তাদের গলার জোর অনেক বেশি। তারা একসঙ্গে ডাকতে শুরু করে, আবার হঠাৎ করে একসঙ্গে থেমে যায়। একজন শুধু থামে না। সে ডেকে যেতেই থাকে। সে সম্ভবত ঝিঁঝি পোকাদের লীডার।

আনিস উঠে দাঁড়াল। রাত হয়ে গেছে। কোয়ার্টারে ফেরা দরকার। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। অন্ধকারে সাইকেল চালানো কষ্টকর ব্যাপার। রাস্তাটা খানাখন্দে ভরা। সাইকেল টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

কাঠগোলাপের গাছে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে শতশত জোনাকি পোকা জ্বলছে— সাইকেল নেই। আনিসের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কেউ একজন চুপিচুপি সাইকেল নিয়ে চলে গেছে। সাইকেলটা তার শখের জিনিস ছিল। পোষা কুকুরের ওপর যেমন মায়া পড়ে, সাইকেলের ওপরও সে রকম মায়া পড়ে গেছে। আনিস খুবই অবাক হয়ে লক্ষ করল— তার রাগ লাগছে না। মন খারাপ লাগছে। জোনাকি পোকাগুলো ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। অতি সুন্দর দৃশ্য। এই দৃশ্যও মন টানছে না। আনিস হাঁটতে শুরু করল। জোনাকি পোকাগুলো পেছনে পেছনে আসছে। এরা সরাসরি উড়ছে না। ঢেউ-এর মতো ওঠানামা করছে। আনিস আরেকটা সিগারেট ধরাল। সাইকেলের শোক ভোলার চেষ্টা করতে হবে। মাথায় অন্য কোনো চিন্তা ঢুকাতে হবে। জোনাকি পোকা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। মানুষ কি কখনো জোনাকি পোকা পোষ মানাতে পেরেছে? মানুষের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। পশু, পাখি, মৌমাছি যে পোষ মানাতে পারে— জোনাকি পোকা সে পোষ মানাতে কেন পারবে না? মানুষ বিচিত্র সব জিনিস চেষ্টা করে দেখে— এই চেষ্টাটা কেউ কি করে নি? জোনাকি পোকা পোষ মানানো গেলে সে কিছু জোনাকি পোষ মানাতো। নবনী এবং সে অন্ধকারে বসে গল্প করবে, আর তাদের দু'জনের মাঝখানে পাঁচশ জোনাকি জ্বলবে নিভবে।

তীক্ষ্ণ গলায় হঠাৎ কে যেন কথা বলল।

কেডা গো ডাক্তার সাব না ?

আনিস থমকে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে ঝোপের মধ্যে কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভয় দেখানোর জন্যে আচমকা কথা বলে উঠেছে।

ডাক্তার সাব ডরাইছেন ?

না।

আমি বদি। চেয়ারম্যান সাব আফনেরে বেচায়েন হইয়া খুঁজতেছে।

ও আচ্ছা।

কোনোখানে খুঁইজ্যা পাই না। শেষে মনে হইল— আফনে আছেন শ্মশানঘাটায়। চইল্যা আসলাম।

ভালো করেছ।

দূর থাইক্যা দেখছি আপনে আসতাছেন— তখন ভাবলাম দেখি আমরার ডাক্তার সাবের সাবাস কেমন। কড়ই গাছের নিচে লুকাইয়া বইস্যা ছিলাম।

চেয়ারম্যান সাহেব কেন ডেকেছেন জান ?

খানা খাইবার জন্যে ডেকেছেন। উনি একলা খানা খাইতে পারেন না। আইজ খানার আয়োজন ভালো। খাসি জবেহ হয়েছে।

ও।

ঝড় হয়েছে যে এই জন্যে জানের ছদকা। চেয়ারম্যান সাব ঝড় তুফান খুব ভয় পায়।

তুমি ভয় পাও না ?

আমিও ভয় পাই। গরিবের ভয় নিয়া কোনো আলাপ হয় না। বড়লোকের ভয় নিয়া আলাপ হয়। দেন ব্যাগটা আমার হাতে দেন।

থাক।

থাকব ক্যান। আপনে ব্যাগ নিয়া কষ্ট কইরা হাঁটবেন আর আমি বাবুসাবের মতো হাত পাও নাচাইয়া হাঁটব এইটা হয় না।

বদি জোর করে ব্যাগ নিয়ে নিল।

চেয়ারম্যান সাহেবের নাম জহির উদ্দিন খাঁ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। শক্ত সমর্থ চেহারা। জীবনের বেশির ভাগ সময় মানুষকে ধমক ধামক দিয়ে পার করেছেন বলে চেহারায় ধমকের স্থায়ী ছাপ পড়ে গেছে। শান্ত ভঙ্গিতে যখন

বসে থাকেন তখনও মনে হয় সামনের মানুষটাকে ধমকাচ্ছেন।

লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তার দু'টা ঘর আছে। একটা হলো বাংলা ঘর— সাধারণ পরিচিতজনরা সেখানে বসে। আরেকটা হলো ভেতর বাড়ির দিকের একটা ঘর যার নাম মাঝলা ঘর। মাঝলা ঘর ঘনিষ্ঠ জনদের জন্যে। মাঝলা ঘরে বিরাট খাট পাতা আছে। অতিথিদের খাটে পা তুলে উঠে বসতে হয়। তিনি একা কাঠের একটা চেয়ারে বসেন। চেয়ারের সামনে জলচৌকি। তিনি পা তুলে দেন জলচৌকিতে।

আনিস ভেবেছিল চেয়ারম্যান সাহেবের মাঝলা ঘরে গিয়ে দেখবে ঘর ভর্তি লোক। সব সময় তাই থাকে। আজ ঘর ফাঁকা। জহির উদ্দিন খাঁ গম্ভীর মুখে পান চাবাচ্ছেন। ঠোঁটের ফাক দিয়ে পানের লাল পিক গড়াচ্ছে। চেয়ারের হাতলে রাখা গামছায় পানের পিক মুছছেন।

ডাক্তার আছ কেমন ?

জ্বি ভালো।

গজব হয়ে গেছিল— এমন ঝড় আমি জীবনে দেখি নাই। এই যে বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে এখনো কমে নাই। আয়াতুল কুরশি পড়ার চেষ্টা করছিলাম ভয়ের চোটে সূরা ভুলে গেলাম। যতই চেষ্টা করি মনে আসে না। তুমি আসার আগে আগে মনে পড়েছে। তিনবার পড়েছি। পা তুলে আরাম করে বস ডাক্তার।

আনিস পা তুলে বসল।

একটা বালিশ নিয়ে হেলান দাও। তোমাকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি এইটা বোধহয় তুমি জান না। আমার রাগ যেমন বেশি, স্নেহও বেশি। ফাজিল লোকজন রাগটা দেখে, স্নেহ দেখে না। তোমার মনটা খারাপ কেন ?

মন খারাপ না।

বৌমা আবার কবে আসবে ?

সামনের সপ্তাহে আসার কথা। তার তো ইউনিভার্সিটি খোলা। ইচ্ছা থাকলেও ইউনিভার্সিটি ফেলে আসতে পারে না।

চেয়ারম্যান সাহেব পিক মুছতে মুছতে বললেন, স্ত্রীদের ইউনিভার্সিটি হলো তাদের স্বামী। এর বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটি নাই। বৌমাকে আসার জন্যে চিঠি দিয়ে দাও। এই বাংলা মাসের একুশ তারিখ ধলা গ্রামে আড়ং হবে— ষাঁড়ের লড়াই। শহরের মেয়ে এইসব তো দেখে নাই। দেখলে মজা

পাবে। আসতে বলে দাও।

জ্বি আচ্ছা।

ষাঁড়ের লড়াই তুমি দেখেছ ?

জ্বি না।

অতি মনোহর। এই বৎসর লড়াই-এ আমার নিজের ষাঁড় আছে। ষাঁড়ের নাম জুম্মা খান। দেখি জুম্মা কী করে। সরবত খাও— দিতে বলি।

জ্বি না সরবত খাব না।

খাও। খেলে ভালো লাগবে। দুধ পেস্তাবাদাম দিয়ে বানানো সরবত। বরফের কুচি দিয়ে ঠাণ্ডা করা। বরফ আনায়েছি নেত্রকোনা থেকে। বরফ অবশ্যি সরবত বানানোর জন্যে আনি নাই। আমি মাঝে মধ্যে সামান্য মদ্যপান করি। তার জন্যে বরফ লাগে। তুমি মদ্যপান কর ?

জ্বি না।

তোমার আগে যে ডাক্তার ছিল— সিদ্দিক নাম সে এই লাইনে ওস্তাদ লোক ছিল। পুরা এক বোতল একা খেয়েছে। তারপরেও কিছু হয় নাই। যাই হোক সরবত খাও।

চেয়ারম্যান সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন— সরবত আন।

সরবত মনে হলো তৈরিই ছিল। চেয়ারম্যান সাহেবের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরবতের গ্লাস নিয়ে ঘরে সতেরো আঠারো বছরের একটা মেয়ে ঢুকল। আনিস চমকে উঠল। গ্রাম ঘরে এমন রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ঠোঁট পর্যন্ত লাল। লিপিস্টিকের লাল না, পানের রসের লালও না। এম্নিতেই লাল। যেন টোকা দিলেই রক্ত বের হবে।

চেয়ারম্যান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন— এর নাম হেনা। আমার দূর সম্পর্কের ভাইস্তি। অনাথ মেয়ে। পিতামাতা গত হয়েছে— থাকত মামার বাড়িতে। তারা খুবই অত্যাচার করত। শেষে আমার কাছে এনে রেখেছি। মেয়েটাকে ভালো করে দেখ ডাক্তার।

আনিস অস্বস্তিতে পড়ে গেল। মেয়েটাকে ভালো করে দেখার কী আছে সে বুঝতে পারছে না।

মেয়ে সুন্দর কি না বল ?

জ্বি সুন্দর।

ভালো করে দেখেছ তো ?

জ্বি।

সিনেমার কোনো হিরুইন এই মেয়ের কাছে আনলে মনে হইব— বান্দি। ঠিক বলেছি না ?

ডাক্তার চুপ করে রইল।

চেয়ারম্যান সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, এখন এই মেয়ের জন্যে শহর থেকে পাত্র জোগাড় করবা। তোমার অবিবাহিত বন্ধু বান্ধব আছে না ? তাদের চিঠি দিবা। সঙ্গে কন্যার ছবি দিয়া দিবা। ময়মনসিংহ শহরে নিয়া স্টুডিওতে হেনার ছবি তুলিয়েছি। চেহারা যত সুন্দর ছবি তত সুন্দর হয় নাই। ছবি তোমার কাছে পাঠায়ে দিব।

হেনা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। তার ঠোঁট কাঁপছে, মনে হয় সে কেঁদে ফেলবে। জহির উদ্দিন খাঁ হেনার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করে বললেন— যা এখন ঘরে যা।

বাংলা ঘরে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে এটা বুঝা যাচ্ছে। জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবের সুরেলা গলা শোনা যাচ্ছে, মিলাদ হচ্ছে—

বালেগাল উলা বে কামালিহি
হাসানুদ্দোজা বে জামালিহি

চেয়ারম্যান সাহেব আরেকটা পান মুখে দিতে দিতে তিক্ত গলায় বললেন— জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবের বিষয়ে একটা খুবই খারাপ কথা শুনেছি। সকাল বেলা তিনি দুধ খান। হাসানের ছেলে রোজ সকালে তারে এক পোয়া দুধ দিয়া আসে। ছেলেটার বয়স আট-নয়। গত সোমবারে সে দুধ নিয়া গেছে। ইমাম সাহেব তখন ছেলের হাত ধইরা দরজা লাগায়ে দিল... ঘটনা কি ঘটল বুঝতে পারছ ডাক্তার ?

আনিস কিছু বলল না। চুপ করে রইল। চেয়ারম্যান সাহেব পানের পিক মুছতে মুছতে বললেন— আমি সন্ধান নিতেছি ঘটনা যদি সত্যি হয় এই ইমামরে আমি নেংটা করাইয়া গ্রামের চারদিকে চক্কর দেওয়াব। এই অঞ্চলে খারাপ লোক আমি একলা থাকব আর কাউরে থাকতে দিব না। ডাক্তার যাও মিলাদে সামিল হও। আমি সামিল হতে পারব না। মদ্যপান করেছি। এই অবস্থায় মিলাদে যোগ দেয়া যায় না।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। চেয়ারম্যান সাহেব ইশারা করে আবার তাকে বসতে বললেন—

ডাক্তার বসল। চেয়ারম্যান সাহেব সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন— হেনার বিষয়ে আরো কিছু কথা আছে। তোমারে পরে বলব।

জ্বি আচ্ছা।

আমার কথাবার্তা কি তোমার কাছে আউলা লাগতেছে ?

জ্বি না।

ঝড়ের সময় এমন ভয় পাইছি— আধা বোতল খেয়ে ফেলেছি। কাজেই কথা বার্তা আউলা। কিছু মনে নিবা না। আমি যে লোক খারাপ এই খবর কি তুমি পেয়েছ ?

ডাক্তার চুপ করে রইল। নেশাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সহজ। প্রশ্ন করলে জবাব দিলেও চলে, জবাব না দিলেও চলে। নেশাগ্রস্ত মানুষ নিজের কথাই শুনে। অন্যে কী বলছে, না বলছে তা তার মাথায় ঢোকে না।

আমি লোক খুবই খারাপ বুঝছ ডাক্তার। অত্যধিক খারাপ। এমন সুন্দরী এক মেয়ে নিজের কাছে এনে রেখেছি কেন ? মেয়ের উপকারের জন্যে ? এইটা ভাববা না। যা বলার বলেছি— এরচে' খোলাসা করে বলতে পারব না। তবে আমার মনে স্নেহ মমতা আছে। এই মেয়েরে আমি নিজ খরচায় বিবাহ দিব। গলা-কান-হাতের গয়না দিব।

ডাক্তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মাতাল মানুষ কথা বলতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত আলাপ কোন দিকে যাবে কে জানে। ইমাম সাহেব সম্পর্কে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা মনে হয় মাতাল হবার কারণে বলা। কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয়— মানুষটা ভালো। ইমাম সাহেব সে রকম একজন। সরল মুখ, সরল কথাবার্তা। একবার আনিস রোগী দেখে ফিরছিল, ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। ইমাম সাহেব বিনয়ের সঙ্গে সালাম করে বললেন, ডাক্তার সাহেবের মনটা মনে হয় খারাপ। কী হয়েছে জনাব ?

আনিস বলল, একজন রোগী দেখে এসেছি। রোগীর অবস্থা ভালো না। তাকে শহরে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। এখন সম্ভাবনা নাই বললেই হয়। মনটা এই কারণেই খারাপ।

ইমাম সাহেব বললেন, রোগীর নাম কী ?

আনিস বলল, নাম দিয়ে কী করবেন ?

তার জন্যে খাস দিলে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে দোয়া করব। আপনি রোগীর অবস্থা দেখে মন খারাপ করেছেন। দেখে কষ্ট পেয়েছি। আজ সারারাত ইবাদত বন্দেগী করে রোগীর জন্যে দোয়া করব।

রোগীর নাম সাদেক। পেটে আলসার আছে, পেট ফুটো হয়ে গেছে। রক্ত বমি করছে।

ডাক্তার সাব, আপনি মনটা ঠিক করেন— আমি আল্লাহ্‌পাকের দরবারে হাত উঠাইতেছি। সাদেক নামের সেই রোগী বেঁচে গিয়েছিল। আনিস ইমাম সাহেবকে খবরটা দেবার পর তিনি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। এই প্রকৃতির মানুষ বড় কোনো অন্যায় করতে পারে না।

মতি আছে মর্জিনার ঘরে। তার ঘরটা ছোট। ঘর ভর্তি বিরাট এক চৌকি। চৌকিতে শীতল পাটি পাতা আছে। গৃহস্থালীর যাবতীয় সরঞ্জাম চৌকির নিচে ঢুকানো। হাঁড়িপাতিল, বালতি, টিনের ট্রাঙ্ক, পানির কলসি। দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে দু'টা ফুলতোলা ওয়ারের বালিশ। মর্জিনা ময়লা বালিশে ঘুমুতে পারে না। দু'টা বালিশই পরিষ্কার— ঝকঝক করছে। বালিশের ওয়ারে ফুল তারই তোলা। একটা ফুলের নিচে ইংরেজিতে লেখা MARZINA BEGUM. সূচিকর্মে তার দক্ষতা আছে এটা বুঝা যায়।

মতি বালিশে আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে বিড়ি। সে আয়েশ করে বিড়ি টানছে। মর্জিনা মেঝেতে পিঁড়ি পেতে খেতে বসেছে। সে যে খুব তৃপ্তি করে খাচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছে। মতি বলল, পাখির সালুন কেমন হইছে কিছুতো বললা না।

মর্জিনা বলল, সালুন ভালো হইছে। অতি ভালো হইছে। ঝাল বেশি হইছে কিন্তুক স্বাদ হইছে। আফনে রানছেন?

হুঁ।

আফনে হইলেন গুণের নাগর। হি হি হি।

ভাত খাওনের সময় হাসবা না গো। খাওয়া হইল ইবাদত। ইবাদতের সময় হাসাহাসি করা ঠিক না। আল্লাহ্‌পাক নারাজ হন।

আপনে কি আইজ রাইতে থাকবেন না চইল্যা যাবেন?

বুঝতাছি না। থাকতে পারি আবার চইল্যাও যাইতে পারি।

থাকেন, গফসফ করি।

চৌকির ওপর থেকে মর্জিনার মুখ পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। সে বসেছে মতির দিকে পিঠ দিয়ে। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে মতির দিকে তাকাচ্ছে তখনি তার মুখ দেখা যাচ্ছে। গোলগাল সুন্দর মুখ। বড় বড় চোখ। চোখ ভর্তি মায়া। বাজারের মেয়েদের চোখে মায়া থাকে না। এই মেয়ের চোখে এত মায়া কেন কে জানে? মতি বড়ই উদাস বোধ করল। মেয়েদের মায়া ভর্তি চোখ সব সময় তাকে উদাস করে ফেলে। আল্লাহপাক এই কাজটা ঠিক করেন নাই। মেয়েছেলের চোখে এত মায়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। কিছু মায়া পুরুষের চোখে দেওয়া উচিত ছিল।

মর্জিনা বলল, আইজ যে পাখির সালুন দিয়া ভাত খাব চিন্তাই করি নাই। ঘরে কিছুই ছিল না। ঠিক কইরা রাখছি শুকনা মরিচের ভর্তা দিয়া ভাত খাব।

মতি বলল, রিজিক আল্লাপাকের ঠিক করা। আল্লাপাক ঠিক করেছেন তুমি আইজ পাখির সালুন দিয়া ভাত খাইবা। এইখানে তোমার আমার কিছুই করার নাই। পাখির সালুন সংসদে পাস হইয়া আছে।

তাও ঠিক।

মতি আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসল। উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঘটনাটা চিন্তা কর— আল্লাহপাকের তরফ থাইক্যা তোমার রিজিক পাস হইছে— ডাহুক পাখির সালুন দিয়া ভাত। ঠিক কি না?

হুঁ।

রিজিক পাস হইছে বইল্যাইতো আর পাখির সালুনের বাটি আসমান থাইক্যা নাইম্যা তোমার কোলে পড়ব না? অন্য ব্যবস্থা লাগব। ঠিক কি না চিন্তা কইরা বল।

হুঁ ঠিক।

কাজেই আল্লাপাক একটা ঝড়ের ব্যবস্থা করল— বাড়ি ঘর উল্টাইল, মানুষের বিরাট ক্ষতি হইল, পশু পাখি মরল— ডাহুক পাখি মরল বইল্যা তুমি ডাহুক পাখির সালুন পাইলা। এখন ঘটনা চিন্তা কর— তোমারে খাওয়ানির জন্যে আল্লাপাকরে কী যন্ত্রণা করন লাগল। যা বললাম এর মধ্যে জটিল চিন্তার বিষয় আছে। মাথা ঠাণ্ডা কইরা চিন্তা কর।

নিজের যুক্তিতে মতি নিজেই মুগ্ধ। তার চোখ চকচক করছে। নিজেকে খুবই জ্ঞানী মনে হচ্ছে। মর্জিনা খাওয়া বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে মতির দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যুক্তির এই দিকটা তাকেও স্পর্শ করেছে।

মতি বলল, কী চিন্তা করতেছ ?

মর্জিনা থমথমে গলায় বলল, আপনে আমারে মরা পাখির গোশত খাওয়াইছেন ? ঝড়ে পাখি মরছে, হেই পাখি রাইন্ধা নিয়া আসছেন ?

রাগে মর্জিনার শরীর কাঁপছে। ব্যাপারটা যে উল্টো দিকে যেতে পারে এটা মতির কল্পনাতেও আসে নি। সে হড়বড় করে বলল, আরে কী কও তুমি! জুম্মা ঘরের মওলানা সাবরে জিজ্ঞাস কইরা আসছি। ঝড় তুফানে মরা পাখির মাংস খাওয়া জায়েজ আছে। হাদিসের বইয়ে পরিষ্কার লেখা। তুমিতো লেখা পড়া জান না। লেখা পড়া জানলে তোমারে বই আইন্যা দেখাইতাম। তবে বজ্রপাতে মরা পশুপাখির মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

মর্জিনা ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় চলে গেছে। সে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করছে। লক্ষণ মোটেই ভালো না। মতিকে দ্রুত সরে পড়া দরকার।

আজ রাতটা এখানে থাকতে পারলে ভালো হতো। ডাক্তার সাহেবের সাইকেল সে চুরি করে নিয়ে এসেছে। ভোরবেলা সাইকেলের একটা গতি করা যেত। চুরি করে আনা গরু সামলানো যেমন মুশকিল, সাইকেল সামলানো ঠিক সে রকমই মুশকিল। একবার গরু চুরি করে সে এমন বিপদে পড়েছিল। রাখার জায়গা নাই। শেষে খোয়াড়ে জমা দিয়ে কুড়ি টাকা পেয়েছে। লাভের মধ্যে লাভ কুড়ি টাকা। তার দিনটা ভালোমতো যাচ্ছিল শেষের দিকে এসে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

মর্জিনা বারান্দা থেকে গজগজ করছে— তুই আমারে মরা পাখির গোশত খাওয়াইছস, তোরে আমি যদি গু না খাওয়াই তাইলে আমি সতী মায়ের কন্যা না। আমি বেজন্মা। তরকারির চামুচ দিয়া তরে আমি এক চামুচ কাঁচা গু খাওয়ামু। তুই আমারে অখনো চিনস নাই।

মতি ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল। আর থাকা ঠিক না। তার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। মর্জিনা তুই তোকারি করছে। ভালোবাসার মানুষকে আদর করে তুই তোকারি করা যায় তাতে দোষ হয় না, কিন্তু গালাগালি করে তুই

তোকারি করা যায় না। মরা পাখির গোশত খেয়েছে তো কী হয়েছে। জ্যান্তপাখির গোশত কেউ কোনো দিন খেয়েছে ? হারামজাদি মরা পাখি শুধু দেখল। মরা পাখির পিছনের ভালোবাসাটা দেখল না ?



নবনীর ঘুম ভাঙ্গে সকাল দশটায়।

সপ্তাহে দু'দিন, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবারে তার ক্লাস থাকে ন'টায়। এই দু'দিন ঘড়িতে এলার্ম দেয়া থাকে। যথাসময়ে এ্যালার্ম বাজে। ঘুমের ঘোরে নবনী হাত বাড়িয়ে ঘড়ি হাতে নেয়। এ্যালার্ম বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। অ্যালার্মের পর তার ঘুম গাঢ় হয়। খুব শান্তি শান্তি লাগে। তার ঘুম ভাঙ্গে যথারীতি সকাল দশটায়। ক্লাস করা হয় নি এ নিয়ে তাকে মোটেও চিন্তিত মনে হয় না। দরজা খুলে সে বের হয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, আমার চা কোথায়? বলেই সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। বড় কাপ ভর্তি চা আসবে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আস্তে আস্তে ঘুম কাটাবে। তারপর আসবে দাঁত ব্রাস করার প্রশ্ন। হাত মুখ ধোয়ার প্রশ্ন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের ক্লাস মিস হয়েছে। একটা টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে দুপুর দু'টায়। এডগার এলেন পোর কবিতা নিয়ে আলোচনা।

It was many and many a years ago
In a Kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

আচ্ছা এই কবিতাটার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা একই গাঁয়ের খুব মিল আছে না?

আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

এডগার এলান পোর এনাবেল লীই কি রবীন্দ্রনাথের রঞ্জনা?

স্যারকে এই প্রশ্ন করলে কেমন হয়? স্যার কি খুব রেগে যাবেন? স্যার

আবার অস্বাভাবিক রবীন্দ্রভক্ত। ইংরেজির অধ্যাপকরা রবীন্দ্রভক্ত হন না। শহীদ স্যার রবীন্দ্রভক্ত। শহীদ স্যারের ক্লাসটা না করলে আজ ছুটি। শুক্র শনি এম্নিতেই ছুটি। তিনদিনের ছুটি। নবনী চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে, দ্রুত চিন্তা করছে দুপুরের ক্লাসটা করবে কী করবে না। মন স্থির করতে পারছে না। ক্লাস করাটা জরুরি আবার পরপর তিনদিনের ছুটিটাও জরুরি। কোন জরুরিটা বেশি জরুরি ?

নবনীর শীত লাগছে। সারারাত এসি চলেছে। ঘর এখন ডীপ ফ্রীজের মতো ঠাণ্ডা। ভোররাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একবার ঘুম ভেঙ্গেছে। সে হাত বাড়িয়ে এসি বন্ধ করার রিমোট কনট্রোল খুঁজেছে। পাওয়া যায় নি। বিছানা থেকে নেমে এসির রিমোট কনট্রোল খোঁজার কোনো মানে হয় না। সে কুঁকড়ি মুকড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল শেষ রাতে নবনীর মনে হয়েছে সে এই পৃথিবীতে আগে আগে এসে পড়েছে। আরো বিশ পঁচিশ বছর পর তার জন্ম হলে যন্ত্রণা কম হতো। তখন বিজ্ঞান আরো অনেকদূর এগিয়ে যেত। ঘর বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে হাত বাড়িয়ে রিমোট কনট্রোল খুঁজতে হত না। সে মুখে বলবে— এসি বন্ধ।

ওম্নি এসি বন্ধ।

টিভির চ্যানেল বদলাবার জন্যে বোতাম টিপাটিপি করতে হবে না। মুখে বললেই হবে— চ্যানেল নাম্বার সেভেন, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। ওম্নি চ্যানেল বদলে যাবে। শুরু হয়ে যাবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির চ্যানেল।

রাতে শোবার সময় নবনী সবকিছু হাতের কাছে নিয়ে ঘুমায়। এক বোতল পানি, এসির রিমোট কনট্রোল, টিভির রিমোট কনট্রোল, পছন্দের একটা গল্পের বই এবং একটা খাতা-কলম। বিশেষ ধরনের কলম, লেখার সময় কলম থেকে আলো বের হয়। সেই আলোয় রাতেও লেখা যায়। খাতাটা সে রেখেছে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গলে স্বপ্নটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলার জন্য। কারণ দিনের বেলায় রাতের কোনো স্বপ্নই তার মনে থাকে না। ইদানীং প্রতি রাতেই নবনী ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখছে। নবনীর দূরসম্পর্কের এক চাচা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাইকিয়াট্রির প্রফেসর। তিনি তাঁকে শোবার সময় খাতা-কলম নিয়ে শুতে বলেছেন। নবনীর চিকিৎসা করার সময় তার স্বপ্নগুলো জানা না-কি বিশেষ প্রয়োজন।

গত রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছে কি-না নবনী মনে করতে পারল না। শেষ রাতে একবার যখন ঘুম ভেঙ্গেছে তাহলে ধরে নেয়া যায় স্বপ্ন দেখেই ঘুম

ভেঙেছে। নবনী হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিল। পাতা উল্টাল। হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখেছে। গোটা গোটা করে স্বপ্ন লেখা আছে। এম্নিতে নবনীর হাতের লেখা জড়ানো কিন্তু আধো ঘুম আধো তন্দ্রার সময়ের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার। নবনী লিখেছে—

> স্বপ্নে দেখলাম পানির ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছি। পানি বরফ শীতল। যতই সামনের দিকে এগুচ্ছি ততই পানি বাড়ছে। মনে হচ্ছে আমি গভীর পানির দিকে যাচ্ছি। দৌড়ানো বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। যে দিকে দৌড়াচ্ছিলাম তার উল্টোদিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। সেদিকেও পানি বাড়ছে। আমি ক্রমাগত গভীর পানির দিকে যাচ্ছি। আবারো দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার চারদিকে হিম শীতল পানি। দিগন্তরেখা বলে কিছু নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি এক দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মাঝখানে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানটা গভীর না। পানি আমার কোমর পর্যন্ত। কিন্তু যে দিকে যাওয়া যায়— গভীরতা বাড়ে। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া শুরু হলো। আমার চারদিক থেকে উঁচু হয়ে পানি আসছে। যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে ডুবিয়ে দেবে। ঘুম ভেঙ্গে গেল।

নবনী ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। স্বপ্নটা রাতে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল আসলে তত ভয়ঙ্কর না। এই স্বপ্ন দেখার পেছনে কারণ আছে। সে স্বপ্নে দেখেছে হিম শীতল পানি। এর কারণ ঘর এসির জন্যে খুব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে শীতে কাঁপছিল। এক্সটার্নেল স্টিমুলাই স্বপ্ন তৈরি করেছে। চারদিক থেকে পানি এসে তাকে গ্রাস করছে— এর পেছনেও কারণ আছে। ঘুমুতে যাবার আগে সে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির চ্যানেল দেখছিল। দক্ষিণমেরু নিয়ে প্রোগ্রাম। দক্ষিণমেরুতে পানি পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে মহা চিন্তিত। দক্ষিণমেরুতে পানি পাওয়ার কথা না। তাহলে কি বরফ গলতে শুরু করেছে? যদি দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে যায় তাহলে পুরো পৃথিবী চব্বিশ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এ রকম ভয়ঙ্কর প্রতিবেদন দেখে ঘুমুতে গেলে রাতে পানিতে ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখাইতো স্বাভাবিক।

স্বপ্নের খাতায় কিছু ফুটনোট লিখে রাখা কি দরকার? স্বপ্ন প্রসঙ্গে তার নিজের ব্যাখ্যাও থাকল। এই ব্যাখ্যা সাইকিয়াট্রিস্ট সাহেবের কাজে লাগলেও লাগতে পারে। যে সাইকিয়াট্রিস্ট নবনীকে দেখছেন তাঁর নাম এ. কে. হোসেইন। আইনস্টাইনের চেহারার সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারার খুব মিল আছে। মাথাভর্তি

ধবধবে সাদা চুল। আইনস্টাইনের গোঁফ ছিল, ভদ্রলোকের গোঁফ নেই। সাইকিয়াট্রিস্টরা উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেন এই রকম কথা শোনা যায়। এই ভদ্রলোকের বেলায় সে রকম মনে হয় না। ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলো সুন্দর তবে প্রশ্নের ধরন দেখে বুঝা যায় ভদ্রলোক কিছু না জেনেই নবনীর দুঃস্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে সেদিক থেকে। নবনীর ধারণা প্রফেসর এ. কে. হোসাইন মোটামুটি নিশ্চিত, যে ডাক্তার ছেলের সঙ্গে নবনীর বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে বনিবানা হচ্ছে না। নবনী দুঃস্বপ্নগুলো এই কারণে দেখছে। সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক প্রশ্ন করার সময় চোখ বন্ধ করে প্রশ্ন করেন। এটা নবনীর কাছে খুব অস্বস্তিকর মনে হয়। কয়েকবার সে ভেবেছে সেও জবাব দেবার সময় চোখ বন্ধ করে রাখবে। দু'জন কথা বলছে, দু'জনেরই চোখ বন্ধ— মজার ব্যাপার।

আচ্ছা মা নবনী, দুঃস্বপ্নগুলো কি তুমি বিয়ের আগেও দেখতে?

মাঝে মাঝে দেখতাম।

বিয়ের পর বেশি দেখছ তাই না?

হুঁ।

প্রায় রোজ রাতেই দেখছ?

হুঁ।

তোমার ডাক্তার হাসবেন্ড আনিসও তো শুনেছি গ্রামের দিকে কোথায় কাজ করছে।

ঠিকই শুনেছেন চাচা।

তুমি ওর সঙ্গে থাকছ না?

কীভাবে থাকব— ইউনিভার্সিটি তো খোলা।

ওর কাছে যাও না?

একবার গিয়েছি, গত মাসের এগারো তারিখ। তিন দিন ছিলাম।

তখনো কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ?

হুঁ।

কী দেখেছ মনে আছে?

একটা শুধু মনে আছে। বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। আমরা বের হতে পারছি না, কারণ দরজা খুঁজে পাচ্ছি না।

কাঠের বাড়ি, না দালান?

মনে নেই।

আগুনের সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া ছিল না কি শুধুই আগুন?

তাও মনে নেই।

সেই স্বপ্নে তুমি একা ছিলে, না-কি তোমার সঙ্গে তোমার হাসবেন্ডও ছিল?

মনে নেই চাচা। আমার স্বপ্ন মনে থাকে না। রাতে যা দেখি সকালবেলা ভুলে যাই।

তাহলে এই স্বপ্নটা মনে আছে কীভাবে?

কিছু কিছু স্বপ্ন মনে থাকে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি তো ঢাকাতেই, তাই না?

শ্বশুরবাড়ি ঢাকায় না, তবে আমার শ্বশুর শাশুড়ি ঢাকায় থাকেন। কলাবাগানের একটা ফ্ল্যাটে।

তুমি তাঁদের সঙ্গে থাক না?

জ্বি না। মাঝে মাঝে দেখা করতে যাই কিন্তু থাকি না।

থাক না কেন?

নিজের ঘর ছাড়া আমার ঘুম হয় না। তাছাড়া ওদের বাড়িতে এসি নেই। আমার খুব একটা খারাপ অভ্যাস হয়েছে। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় এসি লাগে। শীতের সময়ও আমি এসি ছেড়ে রাখি। ডাবল লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমাই।

শ্বশুর শাশুড়ি তোমার কেমন লাগে?

মোটামুটি লাগে। খারাপও না, আবার ভালোও না।

এই দু'জনের মধ্যে কাকে তোমার বেশি অপছন্দ?

আমার শ্বশুরকে। উনি বেশি কথা বলেন। উনি কাউকে কথা বলতে দেবেন না। নিজে কথা বলবেন। অন্য কেউ কথা বললে তিনি কেমন জানি বিরক্ত হন। ভ্রূ কুঁচকে তাকান।

কী নিয়ে কথা বলেন?

বেশির ভাগ সময় হোমিওপ্যাথি নিয়ে। রিটায়ার করার পর হোমিওপ্যাথির বই পড়ছেন তো। হোমিওপ্যাথি মাথার ভেতর ঢুকে গেছে।

চিকিৎসা করছেন?

নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে করছেন। আমি যে ক'বার তাঁর কাছে গিয়েছি তিনি জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন।

কী ওষুধ ?

ইপিকাক। আপনি যদি কিছুক্ষণ তাঁর সামনে থাকেন তাহলে আপনাকেও হয়তো কোনো ওষুধ খাইয়ে দেবেন।

তুমি যে সব দুঃস্বপ্ন দেখ তার মধ্যে তোমার শ্বশুরকে কখনো দেখেছ ?

মনে নেই চাচা।

মা শোন, মাথার কাছে সব সময় একটা খাতা রাখবে আর কলম রাখবে। খাতাটা হলো স্বপ্ন-খাতা। স্বপ্ন দেখে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় সঙ্গে সঙ্গে খুব গুছিয়ে স্বপ্নটা লিখে ফেলবে। অবশ্যই তারিখ দেখে। সময় লিখে রাখবে। আপাতত ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি— ডরমিকাম। সাইড এফেক্ট নেই বললেই হয়। বিছানায় যাবার আধঘন্টা আগে একটা ডরমিকাম খাবে।

চাচা আমারতো ঘুমের কোনো সমস্যা নেই, বিছানায় যাওয়া মাত্র আমার ঘুম পায়। ঘুমের ওষুধ খাব কেন ?

ঘুমের ওষুধটা খাবে যাতে সাউন্ড স্লীপ হয়। ঘুম গাঢ় হলে দুঃস্বপ্ন দেখবে না।

দুঃস্বপ্ন না দেখলে স্বপ্নের খাতায় দুঃস্বপ্নগুলো লিখব কীভাবে ? আমার সমস্যাটা কী তা বুঝার জন্যেই তো স্বপ্নগুলোর বিষয়ে আপনার জানা দরকার।

নবনীর কথায় প্রফেসার এ. কে. হোসাইন এমনভাবে বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকালেন যে নবনীর হাসি পেয়ে গেল। সে হাসি চাপা দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, চাচা আপনি ভুরু টুরু কুঁচকে ফেলেছেন কেন ? আপনি কি আমার কথায় বিরক্ত হয়েছেন ?

সামান্য হয়েছি। কেউ যখন তুচ্ছ কথা নিয়ে পেঁচায়— আমার ভালো লাগে না। তোমার মধ্যে এই অভ্যাসটা আছে।

নবনী আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বলল, চাচা আপনার মেজাজ খিটখিটেতো, এই জন্যেই আমার কথা পেঁচানো মনে হচ্ছে। আমি মোটেও পেঁচানো কথা বলছি না। আপনার নাক্সভূমিকা খাওয়া উচিত। খিটখিটে মেজাজের মানুষদের প্রধান ওষুধ হলো নাক্সভূমিকা। দুইশ পাওয়ারের নাক্সভূমিকা সকালে চারটা আর রাতে চারটা করে খাবেন। এই ওষুধ আমি শিখেছি আমার শ্বশুরের কাছ থেকে। আপনি বললে আমি আমার শ্বশুরের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেব।

ভদ্রলোক কিছু বললেন না। স্থির চোখে নবনীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন তাঁর দৃষ্টি দেখে নবনীর মনে হয়েছিল নবনীর মতো রোগী তিনি খুব বেশি দেখেন নি। দেখার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহও নেই।

ভারী গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকল, নবনী!

নবনী ভ্রূ কুচকাল। গলাটা কার চিনতে পারল না। এ বাড়িতে এ রকম গম্ভীর গলাতো কারো নাই। তারপর মনে হলো এটা তার বাবার গলা। খুব চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে যেমন অচেনা মনে হয়, দীর্ঘদিনের পরিচিত গলাও হঠাৎ হঠাৎ খুবই অপরিচিত লাগে। বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয় কে কথা বলছে?

নবনীর বাবা ফরহাদ সাহেব সকাল ন'টার মধ্যে বের হয়ে যান। তাঁর কোনো ছুটি ছাটা নেই। সপ্তাহের যে দু'দিন অফিস বন্ধ সে দু'দিন তিনি যান কারখানায়। তাঁর দু'টা সুতার কারখানা আছে। গাজীপুরে জাপানি কোলাবরেশনে চিনামাটির কারখানা দিচ্ছেন। প্রডাক্টের নাম হবে 'নবনী'। আজ বের হন নি তার মানে কোনো সমস্যা আছে। নবনীর সমস্যা ভালো লাগে না। নিজের সমস্যা তো ভালো লাগেই না। আশেপাশের মানুষদের সমস্যাও ভালো লাগে না। সে চায়ের কাপ হাতে শোবার ঘর থেকে বের হলো। এই কাজটা করতেও তার ভালো লাগছে না। দিনের প্রথম চা সে আরাম করে নিজের ঘরে বসে খেতে ভালোবাসে। দিনের প্রথম অংশ এবং দিন শেষের অংশটি তার নিজের। বাকি অংশগুলো অন্যরা ভাগাভাগি করে নিক।

ফরহাদ সাহেব মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। তার খালি গা, পরনে লুঙ্গি। গৌর বর্ণের মানুষ। মাথা ভর্তি ধ্বধবে সাদা চুল। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষি, কারো সঙ্গেই উঁচুগলায় কথা বলেন না; তারপরেও তাকে মনে হয় দূরের মানুষ। কাছের কেউ না। ফরহাদ সাহেবের সামনে খবরের কাগজ বিছানো। নবনীকে দেখে তিনি হাসি মুখে বললেন, তোর বয়েসী একটা মেয়ে সকাল দশটা পর্যন্ত কী করে ঘুমায় আমিতো ভেবেই পাই না।

নবনী গম্ভীর গলায় বলল, তুমি যেমন আমার ব্যাপারটা ভেবে পাও না, আমিও ভেবে পাই না তুমি কী করে দিনের পর দিন ভোর পাঁচটায় উঠ। তোমার বয়েসী মানুষদের মধ্যে আলস্য থাকবে। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেলেও কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করবে। ঘুম ভাঙা মাত্র লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামবে না।

ফরহাদ সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, অভ্যাস করলেই হয়। চার পাঁচ দিন চেষ্টা করলেই দেখবি ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গার অভ্যাস হয়ে যাবে।

এরকম বিশ্রী অভ্যাস করার দরকার কী?

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গা বিশ্রী অভ্যাস ?

অবশ্যই বিশ্রী অভ্যাস। শরীরকে আরাম দিতে হয় বাবা। শরীরকে কষ্ট দেবার মানে কী ? শরীরকে কষ্ট দেবার মানে হলো, শরীরের ভেতর যে আত্মা বাস করে তাকে কষ্ট দেয়া।

ফরহাদ সাহেব হাসি মুখে বললেন, ভুল লজিকে তোর মাথাটা ভর্তি। তোর যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে একটা চিমটা দিয়ে তোর মাথা থেকে এক এক করে ভুল লজিক বের করে ফেলা।

নবনী বাবার পাশে বসতে বসতে বলল, তুমি আজ অফিসে যাবে না ?

ফরহাদ সাহেব বললেন, না।

যাবে না কেন ? শরীর খারাপ ?

শরীর ঠিকই আছে। যে মানুষ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে তার শরীর এত সহজে খারাপ হয় না। তুই কি মুখ না ধুয়েই চা খাচ্ছিস ?

হুঁ।

তোকে দেখেইতো মা আমার কেমন ঘেন্না ঘেন্না লাগছে।

কিছু করার নেই বাবা, আমি এ রকমই।

ফরহাদ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, তোর এমন অদ্ভুত আচার আচরণ দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কিছু বলে না ?

এখনো বলে নি। নতুন বউতো, চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। লজ্জাটা কেটে গেলে বলবে।

এরা বোধহয় তোর ব্যাপার স্যাপার টের পায় নি। তুইতো থাকিস এখানে। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে তোর বোধহয় দেখাই হয় না ?

সপ্তাহে একদিন যাই।

আজ যাবি ?

না।

এক কাজ কর— আজ যা।

আজ যেতে বলছ কেন ?

ওদের একটা সারপ্রাইজ দে। আমি বিরাট এক মাছ কিনে এনে দেব। মাছ নিয়ে যা। তোর শ্বশুর শাশুড়ি খুশি হবে। আমি নিউমার্কেটে লোক পাঠাচ্ছি। বাজারের সবচে' বড় মাছটা কিনে আনবে। বাংলাদেশে এমন কোনো মানুষ নেই যে বড় মাছ দেখে খুশি হয় না।

তাদের খুশি করার আমার দরকার কী ?

মানুষকে খুশি করার মধ্যে আনন্দ আছে। সেই মানুষ যদি শ্বশুর শাশুড়ি হয় তাহলেতো কথাই নেই। মাছ কিনতে পাঠাব ?

না।

সেকেন্ড থট দিবি ?

সেকেন্ড শুধু না আমি ফোর্থ থট পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছি। মাছ নিয়ে আমি শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি এটা ভাবতেই ঘেন্না লাগছে। চারদিকে মাছ মাছ গন্ধ পাচ্ছি। এই যে চা খাচ্ছি চায়ের মধ্যেও মাছের আঁশটে গন্ধ।

নবনীর চা শেষ হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে চা খাওয়া হয়ে গেছে বলে চা খাওয়ার মজাটা ঠিক পাওয়া যায় নি। আরেক কাপ খেতে পারলে ভালো হতো। তার জন্যে যন্ত্রণা করতে হবে। দোতলা থেকে একতলায় নামতে হবে। তাদের বাড়ির রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, লাইব্রেরি সবই এক তলায়। দুতলাটা স্লীপিং কোয়ার্টার। দু'টা প্রকাণ্ড শোবার ঘর। একটা তার, অন্যটা তার বাবার। মাঝখানে ছোটখাট খেলার মাঠের মতো ফ্যামিলি লাউঞ্জ আছে। সেখানে টিভি, মিউজিক সেন্টার। ফ্যামিলি লাউঞ্জে মোটা গদির ডিভান আছে। শুয়ে শুয়ে ছবি দেখা হলো নবনীর ছোটবেলাকার অভ্যাস। মানুষের কিছু ছোটবেলাকার অভ্যাস বড়বেলাতেও থেকে যায়। নবনীর এই অভ্যাসটি রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কাপ চায়ের জন্যে নবনীকে এক তলায় রান্নাঘরে যেতে হবে। যতক্ষণ ফরহাদ সাহেব আছেন ততক্ষণ কাজের লোকদের কেউই দোতলায় আসবে না। তাদের সে রকম নির্দেশ দেয়া আছে। নবনীর এক তলায় নামতে ইচ্ছা করছে না। ফরহাদ সাহেব বললেন, মুখ শুকনা করে বসে আছিস কেন ?

নবনী জবাব দিল না। ফরহাদ সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করতে করতে বললেন— আজ ইউনিভার্সিটি নেই ?

দু'টার সময় একটা ক্লাস আছে।

যাবি না ?

এখনো বুঝতে পারছি না।

কখন বুঝতে পারবি ?

ক্লাস শুরু হবার আধঘণ্টা আগে বুঝতে পারব।

ফরহাদ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেললেন।

নবনী বলল, হাসছ কেন ?

তোর অভিনয় দেখে হাসছি ?

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, অভিনয় কী করলাম ?

ইনডিসিশনের একটা সুন্দর অভিনয় তুই সব সময় করিস। প্রায়ই দেখি তোর মধ্যে একটা দিশাহারা ভাব— কাজটা করব কি করব না। আমি একশ ভাগ নিশ্চিত ভাবটা লোক দেখানো। কেন এরকম করিস ?

নবনী জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ফরহাদ সাহেব বললেন, কোথায় যাচ্ছিস ?

চা আনতে যাচ্ছি। তুমি দোতলায় আছ— এখন হাজার ডাকাডাকি করেও কাউকে আনা যাবে না। বাবা, তোমাকে কি এক কাপ চা দিতে বলব ? খাবে ?

না। তোর দুঃস্বপ্ন দেখা কেমন এগুচ্ছে ?

ভালোই এগুচ্ছে।

কাল রাতেও দেখেছিস ?

হুঁ।

খাতায় সব লিখছিস ?

হুঁ লিখছি।

সাইকিয়াট্রিস্টকে খাতাটা দেখতে দিয়েছিস ?

না।

দিসতো আমাকে খাতাটা। পড়ে দেখব ঘটনা কী।

আচ্ছা।

ফরহাদ সাহেব হঠাৎ সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। তবে মুখের হাসি আগের মতোই রইল। চোখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি— সরাসরি জবাব দিবি। নকল কনফিউশান না। স্ট্রেইট আনসার— ইয়েস নো টাইপ। প্রশ্নটা হলো— আনিস ছেলেটাকে কি তোর পছন্দ হয়েছে ?

নবনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, না।

পছন্দ হয় নি কেন ?

কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করি নি। পছন্দ হয় নি এইটুক জানি।

সে কি তোকে পছন্দ করেছে ?

হ্যাঁ করেছে। আমার যত সমস্যাই থাকুক আমি পছন্দ করার মতো মেয়ে।

আনিসের সঙ্গে তোর কি এখন যোগাযোগ নেই ?

আছে। সে সপ্তাহে দু'টো করে চিঠি পাঠায়।

তুই চিঠি লিখিস না ?

আমিও লিখি।

তুই ক'টা চিঠি লিখিস ?

আমিও সপ্তাহে দু'টো। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে ?

না।

আমি কি এখন চায়ের সন্ধানে এক তলায় যেতে পারি ?

ফরহাদ সাহেব জবাব দিলেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁকে খুবই চিন্তিত মনে হলো। আজ তিনি অফিসে যান নি মেয়েকে এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করার জন্যে। কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে— এখন তিনি যেতে পারেন। দুপুর একটায় জাপানি ডিজাইনার মি. ওসাকু সানের সঙ্গে তাঁর লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। ওসাকু সান চিনামাটির বাসনকোসনের ডিজাইন দেখাবেন। এই জাপানি শিল্পী না-কি বাংলাদেশী মটিফ নিয়ে কাজ করেছেন। ফরহাদ সাহেবের দুপুরের লাঞ্চে যেতে ইচ্ছা করছে না। তিনি নিজের ওপর সামান্য বিরক্ত বোধ করছেন। তাঁর মেয়ের বয়স বাইশ। সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারে। তাঁর বয়স সাতান্ন। তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে পারেন না।

নবনী নিজেই চা বানাল। নিজের হাতে বানানো চা তার নিজের কখনো পছন্দ হয় না। আজ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মন ভালো হয়ে গেল। চমৎকার চা হয়েছে। লিকার ঘন হয় নি আবার পাতলাও হয় নি। চিনি যতটুকু দেয়া হয়েছে তারচে' একদানা বেশি হলে চা মিষ্টি হয়ে যেত। একদানা কম হলেও মিষ্টি কম লাগত। চা হলো এমন এক পানীয় যার সব অনুপাত নির্দিষ্ট এবং একেক জনের জন্যে একেক রকম।

নবনীর মন এখন ভালো। মন ভালো থাকা অবস্থায় ছোটখাট কিছু অপ্রিয় কাজ করে ফেলা যায়। তেমন খারাপ লাগে না। নবনী ঠিক করে ফেলল কলাবাগানে তার শ্বশুরবাড়িতে যাবে। মাছ সঙ্গে নিয়েই যাবে। দুপুরে ঐ বাড়িতেই খাবে। বাবাকে বলে মাছ কিনাতে হবে। কাউকে ফার্মেসিতে পাঠিয়ে এক পাতা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আনাতে হবে। শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময় অবশ্যই তার মাথা ধরবে। হাতের কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট থাকা দরকার। আজ একটা ছোটখাট এক্সপেরিমেন্টও করা যেতে পারে— মাথা ধরার

ট্যাবলেট আগেভাগে খেয়ে রাখা। মাথা ধরার সুযোগই হবে না। শরীরে আগে থেকেই ওষুধ বসে আছে।

দরজা খুললেন নবনীর শ্বশুর সালেহ সাহেব। নবনীর মনে হলো তিনি খুবই চিন্তিত, বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন। মানুষটা ছোটখাট, দুশ্চিন্তায় এবং উদ্বেগে আরো ছোট হয়ে গেছেন। এই ভদ্রলোককে নবনীর কাছে কার্টুন চ্যানেলে দেখায় এমন কোনো কার্টুন ক্যারেক্টারের মতো মনে হয়। কোন ক্যারেক্টার এটা মনে পড়ছে না।

সালেহ সাহেব নবনীকে দেখে গলা নামিয়ে বললেন, বৌমা তুমি স্ট্রেইট আমার ঘরে চলে যাও। তোমার শাশুড়ির সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। আগে আমার কথা শুনবে— তারপর তুমি যদি তার কথা শুনতে চাও শুনবে। তুমি এসে ভালো করেছ। আমি তোমাকে টেলিফোন করে আনাবার ব্যবস্থা করছিলাম। নাম্বার ভুলে গেছি বলে টেলিফোন করতে পারছিলাম না। নাম্বার তোমার শাশুড়ির কাছে। তার কাছেতো আর নাম্বার চাইতে পারি না।

নবনী চিন্তিত গলায় বলল, নাম্বার চাইতে পারেন না কেন?

অবস্থা সে রকম না। আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। তুমি নতুন বউ। তোমার চোখে যেন কিছু না পড়ে এই জন্যে ঢাকা দিয়ে রাখি। ঢাকাঢাকি আর সম্ভব না। এনাফ ইজ এনাফ।

নবনী বলল, আপনাদের জন্যে একটা মাছ এনেছিলাম। গাড়িতে আছে।

রাখ তোমার মাছ। আস, আমার ঘরে আস।

সালেহ সাহেব উত্তেজনায় কাঁপছেন। কথাও ঠিকমতো বলতে পারছেন না— শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে। চোখ লাল— মনে হচ্ছে গত রাতে ঘুমান নি।

সালেহ সাহেব নবনীর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট ঘর। লেখার টেবিল আর বুক শেলফ ভর্তি ম্যাগাজিন ছাড়া আর কিছু নেই। রিটায়ার করার পর থেকে প্রতি দুপুরে এই ঘরের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে তিনি ঘুমান। স্ত্রীর সঙ্গে মন কষাকষি হলে রাতেও তাঁকে এই ঘরে থাকতে হয়।

ঘরে একটা মাত্র চেয়ার। সেই চেয়ারে নবনীকে তিনি বসালেন। হাত নাড়তে নাড়তে হড়বড় করে কথা বলতে লাগলেন।

মা, খুব মন দিয়ে ঘটনাটা শোন। ঘটনার সূত্রপাত দুই দিন আগে। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম— তোমার শাশুড়ি তার মুখের ওপর সব সময় একটা বই

ঘরে আছে— বইটার নাম হলো 'সাত কাহন'। সমরেশ মজুমদারের লেখা। মা তুমি বইটা পড়েছ?

জ্বি না।

আমিও পড়ি নাই। তোমার শাশুড়ি যা করে তার মধ্যে বাড়াবাড়ি থাকে। বই যে পড়ছে এর মধ্যেও বাড়াবাড়ি আছে। সবসময় মুখের সামনে বই ধরে রাখা চাই। রাতে ঘুমাতে যাচ্ছি সে বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ছে। বাতি জ্বালানো থাকলে আমার ঘুম হয় না। এটা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। বই নিয়ে ঢং করতে পারলেই হলো। সকালে নাশতা খাচ্ছি সেখানেও মুখের সামনে বই।

তারপর?

আমি আজ নাস্তার টেবিলে খুবই ভদ্র ভাষায় বললাম, বই যে পড়ছ— কাহন শব্দের অর্থ জান?

সে বই থেকে চোখ না তুলে বলল, না।

আমি সামান্য রাগ করে বললাম, একটা বই পড়ছ, তার নামের অর্থ জানার ইচ্ছা হলো না?

সে বই থেকে চোখ না তুলে বলল, পড়ার সময় বিরক্ত করবে না।

আমি বললাম, ঘরে চারটা ডিকশনারি। একটা ডিকশনারি দেখলেওতো অর্থটা জানতে পারতে। সে বই নিয়ে গটগট করে শোবার ঘরে চলে গেল।

নবনী বলল, আপনিও উনার পেছনে পেছনে শোবার ঘরে গেলেন?

অবশ্যই। তাকে গিয়ে খুবই ভদ্রভাবে বললাম, নামের অর্থ জানলে বইটা পড়ে আরাম পাবে। তুমি একটা ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছ, সেই ছেলের নাম জানবে না এটা কেমন কথা!

তোমার শাশুড়ি থমথমে গলায় বলল, বই পড়া আর মেয়ে বিয়ে দেয়া এক হলো?

আমি বললাম, অবশ্যই এক।

তখন সে খটাস করে বই বন্ধ করে রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে বলল— বল কাহনের অর্থ কী আমাকে বল। অর্থ জেনে তারপর পড়ব।

আমি তোমার শাশুড়ির ভাবভঙ্গি দেখে একটু টেনশানে পড়ে গেলাম। তার নেচারতো জানি। লোকজন তিলকে তাল করে। তোমার শাশুড়ি তিলকে বড় সাইজের কাঁঠাল করে। ভালো কথা মা, তুমি কি কাহন শব্দের অর্থটা জান?

জ্বি না। কাহনের অর্থ কি কাহিনী? সাত কাহন হলো সাত কাহিনী।

না। কাহন হলো সংখ্যাবাচক। ঐ যে—

চার কড়ায় এক গণ্ডা
দুই গণ্ডায় এক পন
ষোল পনে এক কাহন।

কাজেই এক কাহন হলো একশ বত্রিশ। এক কাহন আম মানে একশ বত্রিশটা আম। সাত কাহন মানে হলো নয়শ চব্বিশ।

নবনী হাসি মুখে বলল, বই এর নাম নয়শ চব্বিশ?

হ্যাঁ তাই। এটা তোমার শাশুড়িকে বললাম। বলার পর সে যে কী করল তুমি বিশ্বাস করবে না। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মহিলা এই কাজটা করতে পারে না। সে বলল, কাহন নামের অর্থ জানার পর বইটা পড়তে ভালো লাগছে না। এই বলে জানালা দিয়ে বইটা ফেলে দিল। বই পড়ল নর্দমায়। ঘটনার এই হলো সারমর্ম। মা আমি ঠিক করেছি, তোমার শাশুড়ির সঙ্গে এক ছাদের নিচে আমি আর বাস করব না। স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি উত্তর মেরু হয় এবং আরেকজন যদি হয় দক্ষিণ মেরু তাহলেও এক ছাদের নিচে থাকা যায়। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা দেখ— আমি হলাম দক্ষিণ মেরু; তোমার শাশুড়ি উত্তর মেরুও না, একেবারে মঙ্গল গ্রহ। আমাদের এক ঘরে থাকা সম্ভবই না।

আপনি যাবেন কোথায়?

তোমার কি ধারণা আমার থাকার জায়গার অভাব? থাকার জায়গার আমার অভাব নাই। সুটকেস, বিছানা গুছিয়ে রেখেছি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে— ভালোই হয়েছে। তুমি আনিসকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিও। প্রয়োজন বোধে টেলিগ্রামও করতে পার।

নবনী আতঙ্কিত গলায় বলল, আপনি সত্যিই সত্যিই চলে যাবেন না-কি?

সালেহ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, অবশ্যই চলে যাব। তুমি মা আমাকে চিন নাই। আমি দুই কথার মানুষও না, তিন কথার মানুষও না। আমি এক কথার মানুষ। আমি ঐ Old vixen এর সঙ্গে বাস করব না। vixen মানে জানতো মা? vixen মানে হলো মহিলা শিয়াল। আমি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি চলে যাব, তখন অবশ্যই চলে যাব।

কখন যাবেন?

এখনই যাব, আবার কখন? পঞ্জিকা দেখে ঘর থেকে বের হবার দরকার নেই। সুতা কেটে গেলে ঘর থেকে বের হতে হয়। সুতা তো কাটা হয়ে গেছে।

বাবা একটা কাজ করলে কেমন হয়? দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যান।

আমি আপনাদের জন্যে বিরাট একটা রুই মাছ এনেছি।

সালেহ্ সাহেব পুত্রবধুর দিকে তাকিয়ে ছোটখাট একটা ধমক দিলেন। তারপর নিজের মনে বিড় বিড় করে বললেন, বাংলায় একটা প্রবচন আছে—

মরিচ জব্দ শিলে
বউ জব্দ কিলে

বলেই ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— বিরাট ভুল হয়ে গেছে। বিয়ের পর পর যদি এই প্রবচন অনুযায়ী কাজ করতাম তোমার শাশুড়ি জব্দ থাকত।

নবনী হেসে ফেলল। সালেহ্ সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে পুত্রবধুর দিকে তাকালেন। এবং হন্তদন্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। তিনি সিঁড়ি ভেঙে নামছেন, তার ধুপধাপ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

নবনী তার শাশুড়ির কাছে ছুটে গেল।

নবনীর শাশুড়ি ফরিদা বেগম নিরুদ্বিগ্ন গলায় বললেন, মা তুমি দুঃশ্চিন্তা করো নাতো। তোমার শ্বশুর এর আগে খুব কম করে হলেও তিনশবার ঘর থেকে বের হয়েছে। এটা নতুন কিছু না। সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসবে। তোমার শ্বশুরের দৌড় হচ্ছে রেলস্টেশন পর্যন্ত। রাগারাগি করে রেলস্টেশন পর্যন্ত যাবে, তারপর মুখ শুকনা করে ফিরে আসবে। রাগ করে অন্তত একবার সপ্তাহ খানেক বাইরে থেকে এলেও বুঝতাম পুরুষ মানুষের কিছু তার মধ্যে আছে। কিছুই নাই।

নবনী হাসল। শাশুড়িকে তার বেশ পছন্দ। এ বাড়িতে এলেই সে তার শাশুড়ির সঙ্গে গুটুর গুটুর করে গল্প করে।

ফরিদা বললেন, মা তুমি কি আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে ?

নবনী হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল।

ফরিদা বললেন, তাহলে এক কাজ কর— তুমিই মাছটা রান্না কর। বৌমার হাতের রান্না খাই।

নবনী বলল, মা আমি রাঁধতে পারি না। শুধু চা বানাতে পারি।

ফরিদা বললেন— রান্না কোনো ব্যাপারই না। আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

নবনী রান্না চড়িয়েছে। জীবনের প্রথম রান্না। সে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছে। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে রান্নাটা যদি সত্যি সত্যি ভালো হয় তাহলে বাটিতে করে এক বাটি মাছ সে তার বাবার জন্যে নিয়ে যাবে।

ফরিদা রান্নাঘরে বসে জাতি দিয়ে সুপুরি কাটছেন। চিকন করে সুপুরি কাটার অস্বাভাবিক দক্ষতা তাঁর আছে। এই বিদ্যাটিও তিনি তাঁর পুত্রবধূকে শেখাতে চান। আজ না, অন্য কোনোদিন। একদিনে অনেক কিছু শেখাতে নেই। ফরিদা সুপুরি কাটা বন্ধ করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন— আনিসকে তোমার কেমন লাগে মা ?

নবনী কিছু বলল না।

ফরিদা হালকা গলায় বললেন, পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে চাপা। আর আমার ছেলেটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই চাপা। কিন্তু মা ছেলেটা ভালো। খুবই ভালো। কিছু দিন ধৈর্য ধরে যদি তার সঙ্গে থাক তাহলে দেখবে তাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে।

নবনী তার শাশুড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ফরিদা তাঁর পুত্রবধূর দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুপারি কাটতে কাটতে বললেন— চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না মা।

নবনী বলল, আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেই নি। বলেই তার মনে হলো সে ভুল কথা বলেছে। সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। কঠিন সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তের কথা কাউকে জানাতে ইচ্ছা করছে না।

ফরিদা শান্তগলায় বললেন, মাগো আমি তোমার শ্বশুরের মতো বোকা মানুষ না। আমার অনেক বুদ্ধি। তুমি যে একটা কিছু ঠিক করেছ তা আমি জানি। তোমার মাছ হয়ে গেছে। মাছের ডেগচিটা নামাও।

নবনী চুলা থেকে হাঁড়ি নামাল। ফরিদা বললেন, তরকারির রঙ ভালো হয়েছে। এখানে যে সব হলুদ পাওয়া যায় তাতে তরকারিতে রঙ হয় না। পাটনাইয়া হলুদে ভালো রঙ হয়। লবণ মনে হয় সামান্য বেশি হয়েছে। সুরুয়া কেমন ছাড়াছাড়া লাগছে। একটু লবণ চেখে দেখতো।

নবনী লবণ চেখে বিস্মিত গলায় বলল, আপনি এত কিছু শিখেছেন কোথায় ?

আমার মা'র কাছে শিখেছি। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনি তোমাকে শেখাতেন। এখন আমি শিখাব।

নবনী কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। ফরিদা বললেন, মা তুমি কি বলতে চাও বলে ফেল।

কিছু বলতে চাচ্ছি না।

কিছু অবশ্যই বলতে চাচ্ছিলে, শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে মনে হয়েছে বলা ঠিক হবে না। তুমি বলতে পার— আমি যে-কোনো কিছুই সহজভাবে নিতে পারি।

নবনী বলল, ধরুন কোনো কারণে যদি আপনার ছেলের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তারপরেও কি শেখাবেন ?

ফরিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তারপরেও যদি তোমার আমার এখানে আসার মতো সাহস থাকে তাহলে অবশ্যই শেখাব।

দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। ফরিদা বেগমের ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসির রেখা। তিনি নবনীর দিকে তাকিয়ে আনন্দিত গলায় বললেন— তোমার শ্বশুর চলে এসেছেন। আজ মনে হয় স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারে নি। তার আগেই ফিরে এসেছে। নবনী বলল, মা আপনি খুবই ভাগ্যবতী একজন মহিলা। ফরিদা বললেন, অবশ্যই আমি ভাগ্যবতী। বাংলাদেশে প্রথম পাঁচজন ভাগ্যবতী স্ত্রীর তালিকা তৈরি হলে সেখানে আমার নাম থাকবে।

দরজার কড়া অতি দ্রুত নড়ছে। সালেহ্ সাহেবের গলার স্বরও পাওয়া যাচ্ছে— ফরিদা। ফরিদা।

নবনী দরজা খোলার জন্যে উঠতে যাচ্ছে, ফরিদা বললেন, তুমি বোস মা। দরজা খোলার দরকার নাই। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করুক। শাস্তি হোক।



বিরাটনগর হাই স্কুলের সামনে আজ চাপা উত্তেজনা।

গুজব শোনা যাচ্ছে আজ জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবকে নেংটো করে স্কুলের মাঠে চক্কর দেওয়ানো হবে। গুজবটা কেউ ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। চেয়ারম্যান সাহেব বিচিত্র সব কাণ্ড করেন। তার পক্ষে এই ধরনের শাস্তি দেয়া অসম্ভব না। আবার জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবের মতো মানুষকে নেংটো করে কানে ধরে চক্কর দেওয়ানো হবে এটাও বিশ্বাসযোগ্য না।

স্কুল ঘরের সামনে কয়েকটা চেয়ার এবং দু'টা বেঞ্চ রাখা হয়েছে। মাঝখানের চেয়ারে চেয়ারম্যান সাহেব পা তুলে বসেছেন। তার পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিও ধবধবে সাদা। তবে সিল্কের না বলে চকচক করছে না। চেয়ারম্যান সাহেবের মুখ ভর্তি পান। পান খেলেই তার মুখ হাসিহাসি হয়ে যায়। তার মুখ হাসিহাসি। চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে আছেন হাই স্কুলের হেডমাস্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র এম.এ.বি.টি.। হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকও আছেন। শিক্ষকরা সবাই চুপচাপ। তারা গত তিন মাসে কোনো সরকারি ডিএ পাচ্ছেন না। ছাত্র বেতনের আদায় খুবই সামান্য। জহির খাঁ সাহেব প্রতি মাসে স্কুলে বেশ কিছু টাকা দেন। গত দু'মাসে সেই টাকাও দিচ্ছেন না। ঘটনা কী জানা যাচ্ছে না। শিক্ষকরা শংকিত। বিরাটনগরের গণ্যমান্যদের মধ্যে সরকার বাড়ির ইরফান সরকার আছেন। নয়াবাড়ির আজিজ মিয়াও সেজেগুজে উপস্থিত হয়েছেন। আরো কিছু লোকজনের আসার কথা, তারা এখনো এসে উপস্থিত হন নি। আছরের নামাজের পর সবাইকে আসতে বলা হয়েছে। আছরের নামাজের সময় মাত্র হয়েছে। তবে বাজার থেকে বেশ কিছু লোকজন এসেছে। তারা আলাদা বসেছে। বাজারের লোকজনদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। গ্রামের সালিশি বৈঠকে তারাও থাকে, তবে আলাদা থাকে।

চেয়ারম্যান সাহেব নয়াবাড়ির আজিজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, পুকুর কাটাইতেছ শুনলাম।

আজিজ মিয়া বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, একটা ইচ্ছা আছে। ছেলে টাকা পাঠায়েছে— তার ইচ্ছা বড় একটা পুকুর। পাথরের ঘাটলা হইব। পুলাপাইন্যা শখ।

চেয়ারম্যান সাহেব আরো একটা পান মুখে দিতে দিতে বলল, খারাপ কী?

আজিজ মিয়া উত্তেজিত গলায় বলল, ছেলে চিঠিতে লিখেছে—আব্বাজান পুকুরে মাছ ছাড়িবেন কিন্তু মাছ বিক্রয় করিবেন না। মাছ বড় হউক। দেশে ফিরিয়া হুইল বর্শি দিয়া মাছ ধরিব।

জহির খাঁ পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, চিঠি মুখস্থ করে বসে আছ। পুরা চিঠি মুখস্ত, না এই দুই লাইন মুখস্ত?

আজিজ মিয়া লজ্জিত মুখে বলল, অনেকবার কইরা এক চিঠি পড়ি— ইয়াদ থাকে।

তোমার ছেলে ভালো দেখাইছে।

আপনাদের দোয়া।

জহির খাঁ সামান্য গম্ভীর হয়ে গেলেন। আজিজ মিয়া বছর সাতেক আগেও হত দরিদ্র ছিল। ফসল তোলার সময় অন্যের ক্ষেতে কামলা দিত। তার ছেলে কীভাবে কীভাবে কুয়েত চলে গেল। তারপর টাকা পাঠাতে শুরু করল। আজিজ মিয়ার বাড়িতে টিনের ঘর উঠল। সেই টিনের ঘরের পাশে উঠল পাকা বাড়ি। আজিজ মিয়া জমি কেনা শুরু করল। বাজারে ঘর নিল। এখন জানা গেল পুকুর কাটা হবে। জহির খাঁর কানে এসেছে যে আজিজ মিয়া বলে বেড়াচ্ছে— এমন পুসকুনি দিব যে চেয়ারম্যান সাহেবের পুসকুনিরে আমার পুসকুনির সামনে মনে হইব ব্যাঙের ছাতা। অতি অপমানসূচক কথা। জহির খাঁ বিশ্বাস করেন না আজিজ মিয়া এ ধরনের কথা বলতে পারে। তবে পুরোপুরি অবিশ্বাসও করা যায় না। ছোটলোকের যদি হঠাৎ পয়সা হয় তাহলে পয়সার গরমে পাছা গরম হয়ে যায়। মাথা গরম লোক অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলে— সেইসব কথার মাপ থাকে। পাছা গরম লোকের কথার কোনো মাপ থাকে না।

আজিজ মিয়া তৃপ্তির সঙ্গে বলল, ছেলেটা লোক মারফত আমারে আর তার মারে মক্কা শরিফ থাইক্যা কাফনের কাপড় কিন্যা পাঠাইছে। বড়ই আনন্দের ব্যাপার! এই কাপড় কাবা শরীফ ছুঁয়াইয়া আনাইছে।

ভালো তো।

আবার চিঠিতে লিখেছে হজ্জ কইরা যাইতে। সে ব্যবস্থা করবে।

যাও, হজ্জ কইরা আস।

ইচ্ছা আছে কিন্তু নানান ঝামেলায় জড়াইয়া পড়ছি— বাজারে আরেকটা নয়া ঘর নিছি।

বাজারে ঘর নিয়েছ ?

জ্বি, দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে।

ভালো তো।

জহির খাঁ পানের পিক ফেললেন। তার কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল— বিরাটনগরে অনেক কিছুই ঘটছে যার খোঁজ তিনি রাখেন না। বাজারে ঘর রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে সেই খবরও তিনি পান নি এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। আজিজ মিয়া তলে তলে সুড়ং কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা অতি বুদ্ধিমান। ছোটলোকের হাতে হঠাৎ পয়সা এলে নানান আলামত দেখা যায়। এরা তখন বড় কার্পু মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। আড়ং-এ ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্যে ষাঁড় কিনে ফেলে। সপ্তাহে দুই দিন যায় নেত্রকোনা ছবি দেখার জন্যে। আজিজ মিয়া তার কিছুই করছে না— জমি কিনছে, বাজারে ঘর রাখছে। তিনি খবর পেয়েছেন আজিজ মিয়া ব্যবসা ভালোই বুঝে। সরিষার ব্যবসা করে এই বৎসর অনেক টাকা কামিয়েছে।

স্কুলের দপ্তরি নাশতা নিয়ে এল। ধামাভর্তি মাখানো মুড়ি। পেঁপে। ঈশ্বর বাবু বিনীত গলায় বললেন, চেয়ারম্যান সাব নাশতা করেন। চা আসতেছে। গুড়ের রং চা করতে বলেছি। গুড়ের চা আপনার পছন্দ।

জহির খাঁ হাই তুলতে তুলতে বললেন, তোমরা খাও। আমার মুখে পান।

ঈশ্বর বাবু নিচু গলায় বললেন— ভালো নাশতার আয়োজন করার ইচ্ছা ছিল। স্কুল ফান্ডের অবস্থা শোচনীয়। ক্লাসটেনে ছাত্র মাত্র সাতজন।

জহির খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, ছাত্র কম কেন ? পড়াশোনা ভালো হয় না ?

ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ গলায় বললেন— যে সব স্কুলে সেন্টার পায় সেখানে ছাত্র হয়। নকলের সুবিধা হয় কি-না সেটা সবেই আগে দেখে। খুবই দুর্দশায় আছি। অঞ্চলের বিশিষ্ট গণ্যমান্যরা যদি না দেখে তাহলে স্কুল উঠায়ে দিতে হবে।

দাও উঠায়ে দাও। সবকিছুর জন্ম মৃত্যু আছে। স্কুলেরও আছে। আফসোস কইরা তো লাভ নাই। আগে রাজা বাদশা ছিল, তারা হাতি পুষত। স্কুল কলেজ

এইগুলা হইল হাতি। এখন রাজা বাদশা নাই— হাতিও থাকব না। সোজা হিসাব।

আজিজ মিয়া অতি দ্রুত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল অবশ্যই অবশ্যই। স্কুলের শিক্ষকরা আহত চোখে তাকিয়ে রইল আজিজ মিয়ার দিকে।

জুম্মাঘরের ইমাম সাহেবকে আসতে দেখা গেল। চেয়ারম্যান সাহেব তার মনযোগ সেই দিকে দিলেন। একসঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে নাই। চিন্তা ভাবনা হলো পুতির মালার মতো। একেকটা চিন্তা একেকটা পুতি। আর সুতাটা হলো চিন্তার লাইন। সব পুতি এক লাইনে বাঁধতে হয়। এই কাজ সবাই পারে না। ইমাম সাহেবের কাছে গত রাতে তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। লোক মারফত তিনি একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। ইমাম যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে তিনি তাঁকে নেংটা করে ঘুরাবেন না। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ইমামের চাকরি বহাল থাকার সম্ভাবনা আছে। দোষ স্বীকার না করলে শাস্তি হবে।

ইমাম সাহেবের চোখ রক্তবর্ণ। তিনি গত কয়েক রাত ধরে ঘুমাচ্ছেন না তা তাঁকে দেখেই বুঝা যাচ্ছে। ঠিকমতো হেঁটে আসতেও পারছেন না। মাতালের মতো হেলে দুলে এগুচ্ছেন। জুম্মার নামাজের দিন তিনি যে পোশাক পরেন আজও তাই পরেছেন— কালো আচকান, মাথায় সাদা পাগড়ি। সাদা পাগড়ির সঙ্গে কালো আচকান খুব মানিয়েছে, তাকে সুফি সুফি লাগছে। আজ তিনি চোখে সুরমাও পরেছেন। অন্য যে-কোনো সালিশির দিনে ইমাম সাহেব আসা মাত্র তাঁকে চেয়ার দেয়া হয়। আজ দেয়া হলো না। তিনি জহির খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখে মুখে দিশাহারা ভাব।

ইমাম সাহেবের নাম ইয়াকুব। উলা পাস। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। তিনি পাঁচ বছর হলো বিরাটনগরে আছেন। তার বাড়ি মধুপুর। স্ত্রী এবং দুই কন্যা মধুপুরেই থাকে। তিনি মাঝে মধ্যে মধুপুর তাদের দেখতে যান। বছর দুই আগে ইমাম সাহেবের স্ত্রী তার দুই কন্যাকে নিয়ে এখানেও বেড়াতে এসেছিলেন— এক সপ্তাহ ছিলেন। গ্রামের মানুষজন তখন তার দুই কন্যার রূপ দেখে মোহিত হয়েছিল। বড় মেয়েটির নাম সকিনা, ছোটটির নাম জরিনা। গ্রামের মানুষজন এখনো কোনো রূপবতী মেয়ে দেখলে বলে— ইমাম সাহেবের বড় মেয়ে সকিনার মতো সুন্দর।

সকিনার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পান-চিনি হয়ে গেছে। কার্তিক মাসের নয় তারিখ বিবাহ। ছেলে সরকারি কলেজে অংকের লেকচারার। ইমাম সাহেব

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। দেশে রওনা হবার আগে এমন বিপত্তি।

চারদিকে গুনগুন হচ্ছিল। ঈশ্বর বাবু উঠে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বললেন— সাইলেন্স। পিনড্রপ সাইলেন্স। গুনগুনানি বন্ধ হলো। জহির খাঁর পাঞ্জাবিতে পানের পিক লেগে গেছে। তিনি খুবই বিরক্ত চোখে পানের পিকের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইমাম সাহেব ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, চেয়ারম্যান সাব আসসালামু আলায়কুম।

সালাম দিলে নিতে হয়। এটাই নিয়ম। জহির খাঁ নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। সালাম নিলেন না। শব্দ করে মেঝেতে পানের পিক ফেললেন। গলা খাকারি দিয়ে শুকনো গলায় বললেন— আপনি চিন্তা ভাবনা কিছু করেছেন ? অপরাধ স্বীকার করলে ভিন্ন বিবেচনা।

ইমাম সাহেব কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি কোনো অপরাধ করি নাই। আল্লা সাক্ষি আমার দুই কান্দের দুই ফেরেশতা সাক্ষি আমি নিরপরাধ।

জহির খাঁ বিরক্ত মুখে বললেন, আপনের দুই কান্দের দুই ফিরিশতা তো সাক্ষি দিবে না। এদের কথা খামাখা বইল্যা তো লাভ নাই। আপনে বিরাট অন্যায় করেছেন। এই অঞ্চলের নাম বিরাটনগর। এইখানে যা হয় সবই বিরাট। মানুষ যখন অন্যায় করে ছোট অন্যায় করতে পারে না। বিরাট অন্যায় করে। আপনি দোষ স্বীকার না করলে যে শাস্তির কথা বলেছিলাম সেই শাস্তি দিব। আপনে বড় অপমান হবেন।

ইমাম সাহেব কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কোনো দোষ করি নাই, কিন্তু তারপরও দোষ স্বীকার করলাম।

প্যাঁচের কথায় কাজ হবে না ইমাম সাহেব। দোষ করি নাই কিন্তু দোষ স্বীকার করলাম এটা কেমন কথা ? আমি বিবাহ করি নাই কিন্তু সে আমার বিবাহীত স্ত্রী— এইটা কি হয় ?

লোকজন হো হো করে হেসে ফেলল। জহির খাঁ সেই হাসিতে যুক্ত হলেন না। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন— আপনি যে পাপ করেছেন সেই পাপ ব্যাভিচারের চেয়েও খারাপ। আমাদের ধর্মে যে ব্যাভিচার করে তার শাস্তি কী জানেন নিশ্চয়ই। গর্ত খুঁড়ে তাকে ঢুকানো হয়— তারপরে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। আমি সে রকম কিছু করব না। কাপড় চোপড় খুলে কানে ধরে আপনাকে চক্কর দেওয়াব। শাস্তি শেষ। এখন শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করতেছি আপনি কি অপরাধ করেছেন ?

জ্বি করেছি।

আপনি কি সবের কাছে ক্ষমা চান ?

জ্বি চাই।

তাহলে প্রথম কেন বললেন দোষ করেন নাই ?

আমি দোষ করি নাই এইজন্যে বলেছি দোষ করি নাই।

এখন কেন বলতেছেন দোষ করছেন ?

অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে বলতেছি।

অর্থাৎ আপনি স্বীকার করেন না যে দোষ করেছেন ? শেষ জবাব দেন। আমি আর ছওয়াল জবাব করতে পারব না। হ্যাঁ কিংবা না বলেন। দোষ করেছেন ?

জ্বি না।

দোষ তাহলে করেন নাই ?

ইমাম সাহেব হড়বড় করে বললেন— দোষ করেছি।

জহির খাঁ কঠিন গলায় বললেন— আপনে তো একেকবার একেক কথা বলতেছেন।

জনাব আমার মাথাটা আওলায়ে গেছে। আমি কী বলতেছি কী বলতেছি না— কিছুই বুঝতেছি না।

জহির খাঁ শান্ত গলায় বললেন, ঠিক আছে আপনারে বুঝাইবার ব্যবস্থা করতেছি। সবেই চট কইরা বুঝে না। কেউ তাড়াতাড়ি বুঝে আবার কেউ আছে বুইঝাও বুঝে না।

ইমাম সাহেব মাথার পাগড়ি খুলে হাতে নিয়েছেন। গরমে তার মাথার সব চুল ভিজে গেছে। চুল থেকে ঘামের ফোটা কপাল বেয়ে নামছে। তার ঠোঁট নড়ছে। মনে হচ্ছে তিনি দ্রুত কোনো সূরা পাঠ করছেন।

রাত আটটার মতো বাজে। আনিস বিছানায় শুয়ে আছে। বিকেল থেকেই তার গা ম্যাজ ম্যাজ করছিল, এখন শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে। ডাক্তাররা নিজেদের অসুখ বিসুখের ব্যাপারে উদাসীন হয়। আনিস তার ব্যতিক্রম না। থার্মোমিটারে সে জ্বর দেখে নি। দু'টা এনালজেসিক ট্যাবলেট খেয়ে জ্বর কমানোর চেষ্টাও করে নি। হাত পা এলিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার সামান্য দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে রাতের খাবার নিয়ে। তার রান্না বান্না করে দেয় সুজাত মিয়া। বয়স দশ

এগারো। তার পায়ে সমস্যা আছে। একটা পা বড়, একটা ছোট। হাঁটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পরশু সকাল থেকে সুজাত নিখোঁজ। কোথায় গেছে কাউকে কিছু বলে যায় নি। ছেলেটি অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী, কাজ কর্মে দক্ষ। তার একটাই সমস্যা— মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না বলে নিখোঁজ হয়ে যায়। আবার ফিরে এসে কাজকর্ম শুরু করে দেয়। ভাবটা এ রকম যেন কিছুই হয় নি। সে কোথাও যায় নি। এখানেই ছিল।

আনিসের ঘরে হারিকেন জ্বলছে। বিরাটনগরে পল্লী বিদ্যুৎ এসেছে। ডাক্তারের কোয়ার্টারে পল্লী বিদ্যুতের লাইন আছে। ইলেকট্রিকের তারে কী সমস্যা হয়েছে— বাতি জ্বলছে না। তার ঠিক করার জন্যে ইলেকট্রিশিয়ান আনার জন্যে খবর পাঠাতে হবে নেত্রকোনায়। আলসেমির জন্যে খবর পাঠানো হচ্ছে না। আনিস রোজ রাতে ভাবে কালই লোক পাঠাবে। সকালে মনে থাকে না। কাল অবশ্যই লোক পাঠাতে হবে। নবনী চিঠি লিখেছে সে আসবে। নবনী শীতের দিনেও এসি ছাড়া ঘুমুতে পারে না। ফ্যান তো লাগবেই। আশ্বিন মাসে দিনে রোদের তাপ বেশি। রাতটা অবশ্যি ঠাণ্ডা— তারপরেও ফ্যান লাগবে।

নবনীর এবারের চিঠিটা নিয়েও আনিস সামান্য চিন্তিত। চিঠির কথা কেমন যেন এলোমেলো! তার কি কোনো সমস্যা যাচ্ছে ? সমস্যার ব্যাপারটা লেখা নেই। লেখা থাকলে ভালো হতো— আনিস চিন্তা করতে পারত। প্রায় রাতেই তার কোনো কাজ থাকে না। তখন কোনো কিছু নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে।

আনিস বালিশের নিচ থেকে নবনীর চিঠি বের করল। এই চিঠি এর মধ্যেই কয়েকবার পড়া হয়েছে। আরো একবার পড়লে ক্ষতি কিছু নেই।

> ডাক্তার সাহেব,
>
> কেমন আছ তুমি ? জঙ্গলে দিনকাল কেমন কাটছে ? অসহ্য বোধ হওয়া শুরু হয় নি ? আমি যখন ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম প্রথম দিন খুব ভালো লাগত। দ্বিতীয় দিনে ভালো লাগাটা কমে যেত। তৃতীয় দিন থেকে অসহ্য লাগা শুরু হতো। তুমি কীভাবে বৎসর পার করে দিচ্ছ ভাবতে অবাক লাগছে।
>
> আমি ভেবে দেখলাম—তুমি তেল আমি জল। তোমার পছন্দ এক রকম। আমার অন্য রকম। বিবাহ নামক ঝাঁকুনি যন্ত্রের মাধ্যমে তেল জল মিশে যাচ্ছে। আবার ঝাঁকুনি বন্ধ হলেই তেল আলাদা, জল আলাদা। আমাদের সার্বক্ষণিক

সুখে থাকার জন্যে প্রবল ঝাঁকুনি যন্ত্র দরকার। সে রকম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি বলে আমি ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় আছি।

তোমার এখানে তিন দিনের জন্যে আসব। প্রথম দিন আমার খুবই ভালো লাগবে। দ্বিতীয় দিন ভালো লাগাটা একটু কমবে। তৃতীয় দিনে অসহ্য বোধ হতে থাকলে তখন চলে আসব। কিছু মানুষ আছে অসহনীয় অবস্থা সহনীয় করার জন্যে চেষ্টা চালায়। আমার এবং তোমার, আমাদের দু'জনেরই দুর্ভাগ্য আমি সে রকম না। আমি কেন এ রকম হয়েছি সেটা নিয়ে ভেবেছি। উত্তর পাই নি।

তোমাকে জানানো হয় নি ইদানিং আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া-আসা করছি। ভদ্রলোক আমাদের আত্মীয় এবং আমাকে ছোটবেলা থেকেই খুব স্নেহ করেন। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাবার উদ্দেশ্য হলো—তিনি যেন রাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। একবারতো আমি তোমাকে লিখেছিলাম যে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। সেই দুঃস্বপ্নগুলো কত ভয়ঙ্কর তা লেখা হয় নি। রাতে দেখা ভয়ের স্বপ্নগুলো যখন দিনে মনে করি বা কাউকে বলতে যাই তখন খুবই হাস্যকর মনে হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে কী স্বপ্নে দেখেছি শোন— দেখলাম আমি পুরনো ধরনের রেলিং দেয়া খাটে শুয়ে আছি। খাটের চারদিকে রেলিং ধরে আট ন'জন বোরকাপরা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। এবং সবাই হাত বাড়িয়ে আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছেন। আমি নিশ্চিত যে তোমার কাছে স্বপ্নটা মোটেই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। এখন আমার কাছেও মনে হচ্ছে না। কিন্তু স্বপ্নটা দেখার সময় কী যে ভয় পেয়েছিলাম! আমি সাইকিয়াট্রিস্ট চাচার পরামর্শ মতো একটা খাতা বানিয়েছি। সেই খাতার নাম দিয়েছি স্বপ্ন-খাতা। আমি এই খাতায় স্বপ্নগুলো লিখে রাখছি। তোমার এখানে আসার সময় খাতাটা নিয়ে আসব। তুমি পড়ে দেখ। আমি নিশ্চিত তুমি মজা পাবে।

সাইকিয়াট্রিস্ট চাচা আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কী সিদ্ধান্তে এসেছেন শুনতে চাও? তাঁর সিদ্ধান্ত হলো— আমি

নাকি মানসিকভাবে বিয়েটা মেনে নিতে পারছি না। তোমার সঙ্গে বিয়ে আমার মনের ওপর প্রবল চাপ ফেলেছে। এই মানসিক চাপই স্বপ্ন হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এটা সাইকিয়াট্রিস্টের সিদ্ধান্ত। তোমার সিদ্ধান্ত কী? ভালো থেকো।

নবনী

আনিসের শরীর কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। জ্বর কি বেড়েছে? ঘরে থার্মোমিটার নেই। ক্ষিধে লেগেছে, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। দু'টা বিপরীতমুখী ব্যাপার একসঙ্গে কী করে ঘটে? শরীর যন্ত্র নষ্ট হলে এরকম হয়। জলাতংকের রোগীর তৃষ্ণায় বুক ফাটে কিন্তু পানি খেতে পারে না। না উদাহরণটা ঠিক হলো না। জলাতংকের রোগীর তৃষ্ণা হয়, পানিও খেতে চায়— খিঁচুনির জন্যে খেতে পারে না।

মন যন্ত্র নষ্ট হলেও বিপরীতমুখী ব্যাপারগুলো দেখা যায়। পাশাপাশি দু'টি নদী। একটি অন্যটির গায়ের ওপর দিয়ে বইছে। একটির পানি যাচ্ছে সাগরের দিকে। অন্যটির পানি সাগর থেকে উঠে রওনা হয়েছে পর্বতমালার দিকে।

নবনীর মনে কি এরকম দু'টি ধারা বইছে? সে দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে কেন? আনিস কি তার জীবনে বড় ধরনের কোনো আশাভঙ্গের ব্যাপার ঘটিয়েছে?

নবনীর ব্যাপারে আনিসের মনে আশাভঙ্গের কিছু ঘটে নি। সে জানে নবনী চমৎকার একটি মেয়ে। তার একটাই সমস্যা— সে ভয়াবহ নিঃসঙ্গ। আনিস সেই নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে নি। বিরাটনগর ছেড়ে সে যদি ঢাকায় গিয়ে নবনীর সঙ্গে বাস করতেও থাকে তাতেও নবনীর নিঃসঙ্গতা দূর হবে না। কিছু কিছু মানুষ বিচিত্র ধরনের নিঃসঙ্গতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কারোর সাধ্য নেই সেই নিঃসঙ্গতা দূর করে। সেই সব মানুষরা তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার চেষ্টা নিজেরাই করে। তা করতে গিয়ে কেউ বড় লেখক হয়, কেউ হয় চিত্রকর, বিজ্ঞানী। আবার কেউ কেউ হয়তো তার মতো ডাক্তার হয়। চারপাশের মানুষদের নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত থেকে নিজের নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতে চায়।

আনিস নবনীর নিঃসঙ্গতা জানে। নবনী কি আনিসের নিঃসঙ্গতা জানে?

দরজায় শব্দ হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে কেউ একজন কড়া নাড়ছে। কড়া নাড়ার শব্দ থেকে মনে হয় সুজাত ফিরে এসেছে। আনিস উঠে দরজা খুলল।

সুজাত মিয়া না, মতি দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে নতুন শার্ট, নতুন লুঙ্গি। পায়ে নতুন রাবারের জুতা। যে ছাতা হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে ছাতাটাও নতুন। আনিসের সাইকেল বিক্রি করে সে ভালো দাম পেয়েছে। আট শ' টাকা। আট শ'র মধ্যে ছয় শ' নগদ পেয়েছে। দু'শ' টাকা এখনো বাকি আছে। বাকি দু'শ' টাকা আদায় করতে কষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আদায় হয় কি-না সেই বিষয়েও তার ক্ষীণ সন্দেহ আছে। মতির খরচের হাত ভালো। ছয় শ' টাকার প্রায় সবটাই একদিনে শেষ হয়েছে। নিজের জামা-কাপড় ছাড়াও সে দু'টা টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি কিনেছে। একটা মর্জিনার জন্যে, আরেকটা বাতাসীর জন্যে।

বাতাসী মেয়েটা বাজারে নতুন এসেছে। বাতাসীর গলার স্বর অতি মধুর। এমন মধুর স্বরে সে এর আগে কোনো মেয়েকে কথা বলতে শোনে নি। বাতাসীর আরো একটি ব্যাপারে সে মুগ্ধ। সেটা হলো বাতাসীর গায়ের গন্ধ। অবিকল তেজপাতার গন্ধ। মানুষের গায়ে নানা রকম গন্ধ থাকে। তেজপাতার গন্ধও যে থাকে এটা সে কল্পনাও করে নি। মর্জিনার গায়ের গন্ধ টকটক। খারাপ না। টক গন্ধও ভালো লাগে। তবে তেজপাতার গন্ধ অন্য জিনিস।

মতি বাতাসীর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছে বিরাটনগর হাই স্কুলের শিক্ষক। এতে কয়েকটা উপকার হয়েছে। বাতাসী তাকে আলাদা খাতির করছে। 'স্যার' ডাকছে। মতির দিক দিয়ে সামান্য সমস্যা হচ্ছে— কথাবার্তা শিক্ষকদের মতো বলতে হচ্ছে। শুদ্ধ ভাষা বলতে হচ্ছে। মতি এখন সরাসরি বাতাসীর কাছ থেকে এসেছে। শাড়ি দিতে গিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল রাতটা থেকে যাবে। বাতাসী অন্য মানুষ ঘরে নিয়ে নিয়েছে বলে সেটা সম্ভব হয় নি। তবে খুব আফসোস করেছে। দুঃখ দুঃখ গলায় বলেছে— আপনে আইজ আসবেন আগে কইবেন না? মতি বলেছে— আগে থেকে কিছু বলা যায় না। মন উদাস হইলেই শুধু তোমার কাছে আসি। মানুষের মন কখন উদাস হইব কখন হইব না এইটা বলা বেজায় কঠিন। মানুষের মন তো কাঁঠাল না যে জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকব। মানুষের মন যে-কোনো সময় পাকতে পারে।

বাতাসী মুগ্ধ গলায় বলেছে— ইস্! আপনি এত সুন্দর কইরা ক্যামনে কথা কন?

মতি বলেছে, আমরা শিক্ষক মানুষ, আমরার কথার এইটাই ধারা। এই নাও শাড়ি। রঙ পছন্দ হইছে?

বাতাসী হতভম্ব গলায় বলেছে— আমার জন্যে শাড়ি আনছেন? কী আচানক কথা! আফনে মানুষটা অত ভালা কেন হইছেন?

বাতাসীর আনন্দ এবং বিস্ময় দেখে মতির বড় ভালো লেগেছে। মর্জিনার ভেতর এই জিনিস নেই। সে আনন্দিতও হয় না, বিস্মিতও হয় না। শুধু খাবার দেখলে তার চোখ চকচক করে। একটা শাড়ি পেলে সে যত খুশি হয় তারচে' অনেক বেশি খুশি হয় আধা কেজি গরম জিলাপি পেলে।

আনিস বলল, মতি কী খবর ?

মতি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, খবর মাশাল্লাহ ভালো। কয়েক দিন বাইরে কাজকর্মে ছিলাম। গৌরীপুর গিয়েছিলাম। আইজ সন্ধ্যায় ফিরছি। ইস্টিশনে নাইমা শুনলাম আপনার সাইকেল চুরি গেছে। মনটা এমন খারাপ হইছে! ভাবলাম দেখা কইরা যাই।

আনিস ক্লান্ত গলায় বলল, আমার সাইকেল চুরির খবর কি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ?

কী বলেন— এইটা একটা ঘটনা না ? তবে চিন্তা কইরেন না— গৌরীপুরের এক পীর সাহেব আছেন, চাউল পড়া দেন। সেই চাউল পড়া খাওয়াইয়া দিয়া সাইকেল চোর বাইর করা এক ঘণ্টার মামলা।

চাল পড়া দিয়ে সাইকেল চোর ধরা যায় ?

অবশ্যই। পীর সাহেবের চাউল পড়া খাইয়া যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে— সাথে সাথে রক্তবমি। আমার নিজের চউক্ষে দেখা।

আনিস বলল, তুমি কি বসবে না চলে যাবে ? আমার শরীরটা ভালো না। আমি শুয়ে পড়ব।

আপনার যদি অসুবিধা না হয় দুই চাইর মিনিট বসি। আপনার এইখান থাইকা যাব ইমাম সাহেবের কাছে। উনি চইলা যাবেন— দেখা কইরা আসি। যত খারাপ লোকই হউক এতদিন মানুষটা গ্রামে ছিল। তার পেছনে কয়েকবার নামাজও পড়েছি। ডাক্তার সাহেবের কি শরীর বেশি খারাপ ?

মনে হয় বেশিই খারাপ। কেঁপে জ্বর আসছে।

মতি হাই তুলতে তুলতে বলল, আমরার ইমাম সাহেবেরও শুনেছি বেজায় জ্বর। জ্বরের মধ্যে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে। আপনার কাছে কেউ খবর নিয়া আসে নাই ?

না তো!

একটা চক্করের পরেই ঠাশ কইরা মাথা ঘুইরা পইড়া গেল।

আনিস অবাক হয়ে বলল, তোমার কথা বুঝলাম না— কীসের চক্কর ?

মতি তার চেয়েও অবাক হয়ে বলল, ইমাম সাবরে যে আইজ লেংটা কইরা চক্কর দেয়া হইছে আপনে জানেন না ?

না, জানি না।

বাদ আছর চক্কর দেয়ানি হইল। বিরাট জনতা। মনে হইতেছিল ষাঁড়ের আড়ং।

আনিস হতাশ গলায় বলল, চেয়ারম্যান সাহেব শেষ পর্যন্ত এই কাজটা করলেন ?

মতি বলল, করব না আপনে কী কন ? আমরার চেয়ারম্যান সাব এক কথার মানুষ। বাক্কা বেডার চাক্কা। হে যদি বলে আমি বাঘের দুধ খামু তাইলে আপনে নিশ্চিন্ত থাকবেন বাঘের দুধ আসতাছে। সুন্দরবন থাইক্যা বাঘ আইব, হেই বাঘ পানানি হইব— হেই দুধ জামবাটির এক বাটি চেয়ারম্যান সাব নিয়া খাইব।

মতি তুমি বুঝতে পারছ না কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

আপনের কাছে অন্যায়, কিন্তুক গ্রামের আর দশটা লোকের কাছে ন্যায়। যেমন ধরেন— আপনের সাইকেল চুরি হইছে। আপনার কাছে মনে হইছে কাজটা অন্যায় কিন্তু যে চুরি করছে তার কাছে কাজটা ন্যায়।

আনিস শার্ট গায়ে দিল। লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরতে শুরু করল। মতি অবাক হয়ে বলল, শইল খারাপ নিয়া যান কই ?

ইমাম সাহেবকে দেখে আসি।

চলেন যাই। ওষুধের বাক্স সাথে নেন। শুনছি ইমাম সাহেবের অবস্থা ভালো না। ক্ষণে ক্ষণে বমি হইতেছে।

আনিসের খুব খারাপ লাগছে। শুধু খারাপ না রাগও লাগছে। বিরাটনগরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে এইসব নিয়ে তার কখনো মাথাব্যথা ছিল না। যা ইচ্ছা হোক। সে ডাক্তার মানুষ, সে রোগের নিদান দেবে। এর বেশি কিছু না। সে রোগ চিনবে, যে মানুষটাকে রোগে ধরেছে তাকে তার চেনার দরকার নেই। বেচারা ইমাম সাহেবের জন্যে তার এই মুহূর্তে যে মায়াটা হচ্ছে তার কারণটা আনিসের কাছে স্পষ্ট না। ইমাম সাহেব তার খুব যে পরিচিত কেউ তা না। ভাসা ভাসা পরিচয়। হঠাৎ দেখা হলে অল্প কিছু কথা। এই মানুষটা মসজিদ এবং মসজিদের পাশে ছোট্ট চালাঘর নিয়ে একা থাকেন। ভদ্রলোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাতিক আছে। সারাক্ষণই তাকে দেখা যায় হয় মসজিদ পরিষ্কার করছেন নয়তো নিজের বাড়ি পরিষ্কার করছেন। উঠান ঝাঁট দিচ্ছেন, বাড়ির সামনের আগাছা তুলছেন। তিনি মসজিদের চার কোণায় চারটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ লাগিয়েছেন। এই

গাছ চারটার প্রতি তার মমতা অসীম। কারো সঙ্গে কথা হলেই, কৃষ্ণচূড়া গাছের প্রসঙ্গ চলে আসে।

নবনী যখন বিরাটনগরে এসেছিল তখন ইমাম সাহেব বেশ কিছু পাকা তেতুল নিয়ে নবনীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তার বাড়ির দক্ষিণদিকে তেতুলগাছে খুব তেতুল হয়। ইমাম সাহেব বিনীত ভঙ্গিতে নবনীকে বলেছিলেন— আপনার স্বামীর এই অঞ্চলে ভালো চিকিৎসক হিসেবে খুবই সুনাম। উনাকে কিছু উপহার দিব এই সামর্থ আমার নাই। আপনার জন্যে কিছু পাকা তেতুল আনলাম। আমার গাছে হয়েছে। নবনী বলেছিল— গাছ থেকে পেড়ে এনেছেন ?

জ্বি।

গাছে কি এখনো তেতুল ঝুলছে ?

জ্বি।

এইগুলো আপনি নিয়ে যান। আমি গাছে উঠে নিজের হাতে পাকা তেতুল পাড়ব।

ইমাম সাহেব খুবই লজ্জিত গলায় বলেছেন— এটা সম্ভব না। মসজিদের কাছে গাছ। সেই গাছে মেয়েছেলে উঠে তেতুল পাড়বে— এটা ঠিক না।

নবনী তেজি গলায় বলেছিল, ঠিক না কেন ? আল্লাহ রাগ করবেন ?

তার উত্তরে ইমাম সাহেব বলেছেন, আল্লাহপাক এত সহজে রাগ করেন না। কিন্তু মানুষ রাগ করে। আমরা এমন যে মানুষের রাগটাকেই বেশি ভয় পাই।

ইমাম সাহেবের ঘরে হারিকেন জ্বলছে। তিনি মেঝেতে পাটির ওপর কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছেন। শীতল পাটি বমিতে মাখামাখি। তিনি বমির মধ্যেই শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পর পর কেঁপে কেঁপে উঠছেন। তার মনে হয় এজমা আছে। যতবারই নিঃশ্বাস নিচ্ছেন বুকের ভেতর থেকে শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। ঘরে কটু গন্ধ।

মতি বলল, ইমাম সাব জাগনা আছেন ? ডাক্তার সাব আসছেন।

ইমাম সাহেব মাথা তুলে তাকালেন। আবার মাথা নামিয়ে ফেললেন। তাঁকে দেখে মনে হলো না তিনি কাউকে চিনতে পেরেছেন।

আনিস বলল, মতি উনাকে গোসল দেয়া দরকার। গোসল করাতে পারবে ?

মতি বলল, আপনে বললে পারব।

আনিস বলল, বালতিতে করে পানি আন। সাবান আন। দুজনে মিলে গোসল দিয়ে দেই।

মতি বলল, আপনার এত ঠেকা কী ডাক্তার সাব!

ডাক্তার বিরক্ত গলায় বলল, সে একজন রোগী। এই জন্যেই আমার ঠেকা।

মতি ডাক্তারকে হাত দিতে দিল না। নিজেই সাবান দিয়ে ডলে গোসল দিল। শরীর মুছে শুকনো কাপড় পরিয়ে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিল। ইমাম সাহেবের গায়ে জ্বর নেই। জ্বর ছাড়াই তিনি কাঁপছেন। আনিস বলল, আপনি রাতে কিছু খেয়েছেন?

ইমাম সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, জ্বি না।

আপনার খাবার কে রেঁধে দেয়?

আমি নিজে রান্ধি ডাক্তার সাব।

আমি আপনার জন্যে এক গ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে শুয়ে থাকুন। দুটা ট্যাবলেট পাঠাব। দুধ খাওয়ার পরে খাবেন। ঘুমের ওষুধ। ভালো ঘুম হবে।

ইমাম সাহেব কিছু বললেন না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। ডাক্তার দ্রুত চিন্তা করছে— ঘুমের ওষুধ ছাড়াও কি আরো কিছু দেয়া দরকার। মানুষটার স্নায়ুর ওপর দিয়ে একটা ঝড়ের মতো গিয়েছে। উত্তেজিত স্নায়ু ঠিক করতে হলে কী সিডেটিভ দিতে হবে? মানুষটা একা থাকে একজন কেউ সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। কথাবার্তা বলতে পারত। মানুষের সঙ্গ মাঝে মাঝে ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর হয়।

ডাক্তার সাব আপনার অনেক মেহেরবাণী।

মেহেরবানির কিছু না আপনি বিশ্রাম করুন।

ইমাম সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যে অপরাধের জন্যে আমার শাস্তি হয়েছে সেই অপরাধ আমি করি নাই। তবে নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ করেছি। যে কারণে আল্লাহপাকের নির্দেশে আমার শাস্তি হয়েছে। উনার অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না।

ডাক্তার বলল, আপনি কথা বলবেন না। বিশ্রাম করুন। আমি ওষুধ পাঠাচ্ছি।

ইমাম সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বললেন, ডাক্তার সাব আপনার মেহেরবানি।

ফেরার পথে মতি তিক্ত গলায় বলল, কেমন মানুষ দেখছেন ডাক্তার সাব ? মুখে একবার বলল না— ধন্যবাদ। বমি সাফ করা আর গু সাফ করা একই। বমি পেটে আর কিছুক্ষণ থাকলেই গু হইয়া যায়— কথা সত্য কিনা বলেন ডাক্তার সাব।

আনিস জবাব দিল না। ইমাম সাহেবের বাড়ি গ্রামের শেষ মাথায়। আনিসকে শরীরে জ্বর নিয়ে অনেকখানি হাঁটতে হয়েছে। বেশ খারাপ লাগছে। অসহ্য লাগছে মতির বকবকানি। আনিস মতিকে চলে যেতে বলতে পারছে না। কারণ মতিকে দিয়ে ওষুধ পাঠাতে হবে।

গরম কেমন পড়ছে দেখছেন ডাক্তার সাব ?

হুঁ।

এখন আশ্বিন মাস— কেঁথা-শীত পড়নের কথা। পড়ছে গরম। দুনিয়া উলট পালট হওয়া শুরু হইতেছে। কেয়ামত মনে হয় কাছাইয়া পড়ছে। কী কন ?

হতে পারে।

মতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, কেয়ামতের আগে আগে মাটির তল থাইক্যা এক জন্তু বাইর হইব। হে মানুষের মতো কথা বলব। এই জন্তুটা দেখার বড় শখ ছিল। দশ পনরো বছরের মধ্যে কিয়ামত হইলে জন্তুটা দেখতে পারতাম। জন্তুর সাথে দুই চাইরটা কথা বলতে পারতাম। ডাক্তার সাব আপনের কি মনে হয় দশ বছরের মধ্যে কিয়ামত হইতে পারে ?

জানি না মতি।

জন্তুটা কোন ভাষায় কথা বলব কে জানে! চাইনীজ ভাষায় কথা বললে আমরা বাঙালিরা কিছুই বুঝব না।

মতি, কথা বলা একটু বন্ধ রাখ। মাথা ধরেছে।

আমার নিজেরো মাথা ধরছে ডাক্তার সাব এই জন্যেই কথা বেশি বলতেছি। আমি একটা জিনিস পরীক্ষা কইরা বাইর করছি— মাথায় যদি খুব যন্ত্রণা হয় তাইলে কথা বললে যন্ত্রণা কমে। আর কথা না বইল্যা ঘরের চিপাত বইস্যা থাকলে মাথা ধরা বেজায় বাড়ে।

এক গ্লাস দুধ, দুটা বিসকিট আর ওষুধ নিয়ে মতি রওনা হলো ইমাম সাহেবের বাড়ির দিকে। পথে কিছুক্ষণ দেরি হলো— ইস্টিশনের চায়ের দোকানটা খোলা, মতি এক কাপ চা খেল। চা খাওয়া মানেই গল্পগুজব। গল্পগুজবেও কিছু সময় গেল। সেখান থেকে গেল বাতাসীর ঘরে। জেনে যাওয়া— ঐ লোকটা এখনো তার ঘরে আছে কি-না। থাকলেও কিছু যায় আসে

না— না থাকলেও না। লোকটা তো আর বিনা পয়সায় থাকছে না। পয়সা দিয়ে থাকছে। লোকটা যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে বাতাসীর সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়া যাবে। এই ভেবে সে পুরনো কোকের বোতল ভর্তি করে এক বোতল চা সঙ্গে নিয়ে নিল। বাতাসীর ঘরে লোক থাকলে কোকের বোতল নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে যাবে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তাতে অসুবিধা নাই। ঠাণ্ডা চা খেতে মতির খারাপ লাগে না। বরং ঠাণ্ডা চা খেতেই তার বেশি ভালো লাগে।

এত সব করতে মতির অনেক দেরি হয়ে গেল। সে ইমাম সাহেবের বাড়ি পৌঁছাল রাত একটায়। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। আবছা আবছা সব কিছু দেখা যায়। মতি হতভম্ব হয়ে দেখল ইমাম সাহেবের বাড়ির ডান দিকের তেতুল গাছের নিচে কী যেন দাঁড়িয়ে আছে। মতি বলল— কেডা গো?

কেউ জবাব দিল না।

মতি বলল— কেডা? আপনে কে?

এই প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া গেল না।

মতি এগিয়ে গেল। তার জন্যে বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। তেতুল গাছের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। তেতুল গাছের ডাল থেকে ঝুলছিলেন ইমাম সাহেব। মতি অতি দ্রুত দা দিয়ে দড়ি কেটে তাকে নামাল। ইমাম সাহেব বিড় বিড় করে কী যেন বললেন, ঠিক বুঝা গেল না। মনে হলো— পানি খেতে চাইছেন। মতি ছুটে গেল পানি আনতে— তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইমাম সাহেব মারা গেলেন।



নিস্তরঙ্গ দিঘিতে ছোট্ট ঢিল পড়লেও অনেকক্ষণ ঢেউ ওঠে। সেই অর্থে ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে বিরাটনগরে যে ঢেউ ওঠার কথা সেই ঢেউ উঠল না। ঐ দিনই কাকতালীয়ভাবে যোগাযোগ মন্ত্রী চলে এলেন। বিরাটনগর-রোয়াইলবাজার সড়কে মগরা নদীতে পুল হবে, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। আগে কয়েকবার তারিখ দিয়েও মন্ত্রী আসতে পারেন নি। এবারে তাই হুট করে চলে এসেছেন।

মন্ত্রীর আগমন বিশাল ঘটনা। সেই আগমন যদি হেলিকপ্টারের মতো বাহনে হয় তাহলে তো কথাই নেই। বিরাটনগরে যে আলোড়ন উঠল তার তুলনা নেই। বিশাল এক পক্ষী পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে নামছে। তার শব্দে পৃথিবী কাঁপছে। বিরাটনগরের লোকজনের জন্যে তুলনাহীন অভিজ্ঞতা। মন্ত্রীর হেলিকপ্টার দুপুর বারটায় এসে পৌঁছল। তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বিরাটনগর হাইস্কুলের মাঠে এক ভাষণ দিলেন। জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাষণ শুনল। যোগাযোগ মন্ত্রীর যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলার কথা না, যেহেতু স্কুলের মাঠে ভাষণের ব্যবস্থা সেহেতু তিনি শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কিছু কথা বললেন এবং স্কুল ফান্ডে নগদ দশ হাজার টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দান করলেন। গ্রামের মানুষজন তালি দিতে দিতে হাত ব্যথা করে ফেলল।

বক্তৃতা পর্বের শেষে চায়ের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা চেয়ারম্যান জহির খাঁর বাড়িতে। জহির খাঁ অতি অল্প সময়ের নোটিশে চা পানের বিপুল আয়োজন করে ফেললেন। এমন ব্যবস্থা যে মন্ত্রী পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন— প্রত্যন্ত গ্রামেও দেখি ভালো ব্যবস্থা করেছেন! আমি তো এ রকম আশাই করি নি। মন্ত্রী আশা করেন নি এ রকম আরেকটি কাজ জহির খাঁ করলেন— গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে সোনার ঢেঁকি উপহার দিলেন। মন্ত্রীর প্রথমবার আসার তারিখেই জহির খাঁ ঢাকা থেকে পাঁচ ভরি সোনার ঢেঁকি বানিয়ে এনেছিলেন। সেটা শুধু যে কাজে লাগল তা না। অনেকখানি কাজে লাগল। মন্ত্রী তিনবার বললেন— বাহ্

জিনিসটা সুন্দর তো। শুধু যে সুন্দর তা-না, ঢেঁকি শাশ্বত বাংলার প্রতীক। সাধারণত মন্ত্রী শ্রেণীর কাউকে কোনো উপহার দিলে সেই উপহার বেশিক্ষণ হাতে রাখা নিয়ম না। ছবি তোলা হয়ে গেলেই উপহার অন্য কারোর হাতে তুলে দেয়া হয়। সোনার ঢেঁকির ক্ষেত্রে সে রকম হলো না। ফটোগ্রাফারের ছবি তোলার পরও মন্ত্রী উপহার হাতে বসে রইলেন। হেলিকপ্টারে ওঠার সময়ও তার হাতে উপহারটা দেখা গেল।

হেলিকপ্টারের উত্তেজনার পাশে ইমাম সাহেবের মৃত্যু তেমন কিছু না। পর পর দুটি উত্তেজনা মানুষ নিতে পারে না। বড় ধরনের একটি উত্তেজনাতেই মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে। এ রকম ঝিমিয়ে পড়া অবস্থায় ইমাম সাহেবের লাশ নিয়ে নাটক শুরু হলো। মন্ত্রী চলে যাবার পর রোয়াইল বাজার থানার ওসি কিছু হম্বিতম্বি করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, ডেডবডি দেখে তার মনে হচ্ছে না আত্মহত্যা। কেউ খুন করে ঝুলিয়ে রেখেছে। কঠিন তদন্ত হবে। তদন্তে রুই কাতলা বের হয়ে পড়তে পারে। প্রয়োজনে আসল খবর বের করার জন্যে থানায় নিয়ে ট্রিটমেন্ট দেয়া হবে। হম্বিতম্বিতে তেমন কাজ হলো না। জহির খাঁ ওসিকে ডেকে বললেন, খামাখা প্যাচাল করবা না। সুরতহাল টাল কী করতে হয় ব্যবস্থা কর। ডেডবডি মধুপুর পাঠায়ে দিতে হবে।

ওসি সাহেব ধমক খেয়ে মিইয়ে গেলেন। ধমক এমন লোকের কাছ থেকে এসেছে যার বাড়িতে মন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে খাওয়া দাওয়া করেছেন। হেলিকপ্টারে ওঠার আগে আগে কোলাকুলি করেছেন। যে সব মৃত্যু অর্থকরী না, পুলিশ সেসব মৃত্যুর বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পুলিশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। ওসি সাহেব বিমর্ষ মুখে বললেন— সুরতহালের জন্যে ডেডবডি নেয়ার ব্যবস্থা করছি। থানা থেকে ভ্যানগাড়ি আসবে। আত্মীয়স্বজন কেউ যেন যায়। সুরতহালের ফিস আছে। হাজার দুই টাকা যেন সাথে নেয়।

পুলিশের ভ্যান সে রাতে এসে পৌছাল না।

মতি সারারাত ইমাম সাহেবের পাশে রইল। রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত তার সঙ্গে লোকজন ছিল— একে একে সবাই বিদায় হয়ে গেল। মরা মানুষ ফেলে রেখে গেলে শিয়াল-কুকুর খেয়ে ফেলবে। মতির বিরক্তির সীমা রইল না। অন্যদের মতো সেও কেন চলে গেল না ? এ রকম বোকামিটা করল কীভাবে ? তার একমাত্র ভরসা সঙ্গে গাঁজা ভরা সিগারেট আছে। গাঁজার ধোঁয়ায় টান দিয়ে যে-কোনো পরিস্থিতি পার করে দেয়া যায়। সমস্যা একটাই খালিপেটে থাকলে চলবে না। পেট ভর্তি থাকতে হবে।

ইমাম সাহেবের লাশ তার ঘরের চৌকির ওপর রাখা আছে। কম্বল দিয়ে লাশটা ঢাকা। গন্ধ সহজে বের হবে না। মতি বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। শিয়াল কুকুরের ঘরে ঢোকার পথ বন্ধ। সে বসে আছে উঠানে। উঠানের দু'মাথায় দু'টা হারিকেন জ্বালিয়েছে। অগ্নিবন্ধন। জিন, ভূতের দুই দিক থেকেই আসা বন্ধ।

মতি এক ফাকে ইমাম সাহেবের রান্নাঘরও দেখে এসেছে। চাল আছে, ডাল আছে, পিঁয়াজ রসুন আছে। তেলের শিশিতে তেলও আছে। ক্ষিধাটা ভালোমতো লাগলে চাল ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি বসিয়ে দিতে হবে। পেট ভরা থাকলে ভয় কম লাগে। সঙ্গে গাঁজার সিগারেট আছে ছয়টা। একেকটার দাম পড়েছে দশ টাকা করে। ছটা ষাট টাকা। মতি মূলামূলি করে পঞ্চাশ টাকায় কিনেছে। এইসব হলো আরাম করে খাওয়ার জিনিস। তার এমনই কপাল মরা লাশের পাশে বসে সব কটা পুরিয়া শেষ করতে হবে। বেহুদা পঞ্চাশ টাকা চলে গেল।

প্রথম গাঁজার পুরিয়া খেয়ে মতির দুঃখবোধ কেটে গেল। মায়াবোধ প্রবল হলো। তার কাছে মনে হলো— ইমাম সাহেব আহারে বেচারা! মরে পড়ে আছে। নিকট-আত্মীয় পর-আত্মীয় কেউ নেই। ইমাম সাহেবের মতো একজন নামাজি ভালো মানুষের পাশে কে আছে ? আছে মতির মতো দুষ্টলোক। যে ঈদের নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজে সামিল হয় না। মাঝে মধ্যে তওবা করে পাপমুক্ত অবশ্যি হয়। সে অবশ্যি বুঝে, তওবাটা করে সে আল্লাহপাককে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। মতির ধারণা আল্লাহপাকও ব্যাপারটা বুঝেন, তবে বুঝেও চুপ করে থাকেন। এই জন্যেই তিনি রহমানুর রহিম।

মৃত্যুর পর মতির কঠিন শাস্তি হবে এটা সে জানে। যে পড়ে থাকে বাজারের মেয়েছেলের বাড়িতে তাকে আল্লাহপাক আদর করে বলবেন— 'ওরে মতি যা বেহেশতে ঢোক। তাম্বুর নিচে হুরপরী আছে। যারে যারে পছন্দ হয় সাথে নিয়া সরুবান তহুরা খা। যত ইচ্ছা খা।' তা হবে না। আগুনে তাকে পুড়তেই হবে। দু একটা ভালো কাজ সে যে করে নাই তা-না। করেছে। তবে খারাপ কাজের তুলনায় ভালো কাজ এতই নগণ্য যে দোজখের আগুন থেকে সেই পুণ্য তার একটা কেনি আংগুলও বাঁচাতে পারবে না।

এই যে ইমাম সাহেবকে সে পাহারা দিচ্ছে এটা তো একটা ভালো কাজ। কারণ লোকটা ভালো। চেয়ারম্যান সাব লোকটাকে কানে ধরে চক্কর দেয়ায়েছেন— অন্যায় করেছেন। নির্দোষ লোকের শাস্তি হয়েছে। দোষীও হইতে পারে। মানুষ চেনা বড় কঠিন। সবাই তাকে ভালো মানুষ জানে, আসলে সে

বিরাট চোর। মরজিনার নাকফুল চুরি করে কুড়ি টাকায় বেচেছিল। অবশ্য এই টাকাটা সে জরিনার পেছনেই খরচ করেছে। আধা কেজি গরম জিলাপি কিনে খাইয়েছে। নিজে একটাও খায় নি।

হাসানকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়।

হাসান নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবে না। তবে হাসানকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে না। যদি হাসান বলে ঘটনা সত্য তখন কী হবে? মৃত মানুষের খারাপ কিছু নিয়ে আলোচনা করতে নাই। মৃত মানুষকে নিয়ে ভালো ভালো কথা বলতে হয়। এটাই নিয়ম। মতি মরে গেলে কেউ কি তাকে নিয়ে একটা ভালো কথা বলবে। মনে হয় না।

মতি দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। জিনিস খারাপ দেয় নাই— এক নম্বরি জিনিসই দিয়েছে। মনে ফুর্তির ভাব আসি আসি করছে— হয়তো এসেও যাবে। জম্পেশ খিদে জানান দিচ্ছে। এক ফাঁকে খিচুড়ি বসায়ে দিতে হবে। ডিম পাওয়া গেলে ভালো হতো। একটা দুটা খিচুড়ির মধ্যে ছেড়ে দিলে স্বাদ যা হয় তার কোনো তুলনা নাই। তেতুল গাছের নিচে খচমচ শব্দ হচ্ছে। মতি কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। সাধারণ অবস্থায় থাকলে ভয় লাগত। এখন সে সাধারণ অবস্থায় না। শিয়াল-টিয়াল হবে। মরা মানুষের গন্ধ পেয়ে উঁকি ঝুকি মারছে। হাতের কাছে একটা লাঠি রাখা দরকার। শিয়ালের পাল মরা মানুষ একবার খেতে শুরু করলে আধাপাগল হয়ে যায়, তখন জীবিত মানুষ খেতে চায়। ঘরের ভেতরও খচমচ শব্দ হচ্ছে। বেড়া ভেঙে কোনো শিয়াল কি ভিতরে ঢুকে পড়েছে? ঢুকে পড়লে কিছু করার নাই। খাওয়া দাওয়া করে যা থাকে তাই কবরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। মতি আরেকটা সিগারেট ধরাল। মৌতাতটা মোটামুটি জমছে। মনে ফুর্তির ভাব চলে এসেছে। এটা কিছুতেই নষ্ট হতে দেয়া যাবে না। মতি গুনগুন করে গান গাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় গান গাইতে পারলে ভালো হতো। 'চলো যাই মদিনা' ধরনের গান। সে রকম গান একটাও মনে পড়ছে না। সে মাথা দুলাতে দুলাতে সিনেমার গান শুরু করল। এই সিনেমাটা সে মর্জিনাকে নিয়ে নেত্রকোনার হলে দেখে এসেছে। খুবই ট্রাজেডি সিনেমা। মতি উদাস গলায় গাইছে—

হাত খালি গলা খালি
কন্যার নাকে নাক ফুল
সেই ফুল পানিতে ফেইল্যা
কন্যা করল ভুল।

আবারো খচখচ শব্দ হচ্ছে। মতির হাসি পেয়ে গেল— আজ মনে হয় খচখচানির রাত। এবারের খচখচানিটা অন্য রকম। চারপেয়ে জন্তুর খচখচানি না, দু পেয়ে মানুষের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে আসার শব্দ। মতি বলল, কে? বলেই দেখল ডাক্তার সাহেব। গলায় মাফলার পেঁচিয়েছেন বলে মানুষটাকে অন্যরকম লাগছে। দেখে মজা লাগছে। গাঁজার কারণে এটা ঘটছে। এক নম্বরি গাঁজার এই গুণ যা দেখা যায় ভালো লাগে। ডাক্তার সাহেব যদি মাফলার ছাড়া আসত তাহলেও দেখতে ভালো লাগত।

মতি নাকি?

জ্বে ডাক্তার সাব।

কী কর?

মরা পাহারা দেই।

গাঁজা খাচ্ছ না-কি? বিশ্রী গন্ধ আসছে। তোমার গাঁজার অভ্যাসও আছে তা তো জানতাম না।

মতি জবাব দিল না। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। ডাক্তার সাহেবকে দেখে তার ভালো লাগছে। খাঁটি সোনা মানুষ বলেই এত রাতে খোঁজ নিতে এসেছে। এই মানুষটার সাইকেল চুরি করাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। মতি ঠিক করে ফেলল অন্য কোনো জায়গা থেকে একটা ভালো সাইকেল চুরি করে ডাক্তারকে দিয়ে আসবে। তার ডাবল পাপ হবে। হলেও কিছু করার নেই। সাইকেলের অভাবে লোকটার কষ্ট হচ্ছে। সবচে' ভালো হয় যদি পুরনো সাইকেল জোগাড় করা যায়।

ডেডবডি থানায় নিয়ে যাবার কথা ছিল। নেয় নি?

জ্বে না।

ইমাম সাহেবের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেয়া হয়েছে?

জ্বে না। কেউ তারার ঠিকানাই জানে না। শুধু জানে বাড়ি মধুপুর।

ভালো সমস্যা হলো তো।

আনিস বারান্দায় উঠে এল। তার মন বেশ খারাপ হয়েছে। একটা মানুষ মারা গেছে। অথচ তার আশেপাশে কেউ নেই। একজন শুধু উঠানে বসে গাঁজা টানছে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হবে কেন? না-কি সমস্যাটা ইমাম সাহেবের? বিদেশী মানুষ দীর্ঘদিন এখানে থেকেও কারো সঙ্গে মিশ খাওয়াতে পারেন নি।

আনিস বলল, তুমি একা বসে আছ। আর কেউ নেই এটা কেমন কথা!

মতি বলল, সবেই ভয় খাইছে। ফাঁসের মরা। আর জায়গাটাও গেরামের বাইরে পড়ছে। তারপরে ধরেন পুলিশের ঝামেলা আছে।

খাওয়া দাওয়া করেছ মতি ?

জ্বে না।

তোমার খাবার ব্যবস্থা তো করা দরকার।

চিন্তা কইরেন না ডাক্তার সাব। ইমাম সাহেবের পাকের ঘরে চাইল ডাইল সবই আছে। খিচুড়ি বসায়ে দেব।

তাহলে এক কাজ কর— রান্না শুরু কর। আর আমি ইমাম সাহেবের ঘর খুঁজে দেখি চিঠিপত্র থেকে ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা। কেউ কি খুঁজে দেখেছে ?

বলতে পারি না। সবেই ছিল মন্ত্রী নিয়া ব্যস্ত।

ডাক্তার হারিকেন হাতে ঘরে ঢুকে পড়ল। চৌকিতে কালো কম্বলে একটা মানুষ পুরোপুরি ঢাকা। তার শরীর নষ্ট হতে শুরু করেছে। তীব্র না হলেও ভোতা ধরনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মেডিকেল কলেজে আনিসের এক মেডিসিনের প্রফেসর জোবেদ আলি হঠাৎ হঠাৎ বিষয়ের বাইরে কথা বলতেন। গন্ধ বিষয়ে একবার দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন যে বক্তৃতা সিলেবাসে নেই— বাবারা শোন, ডাক্তার হবার আগে নাক তৈরি কর। গন্ধ নিতে শেখ। সব কিছুর গন্ধ আছে। জীবন্ত মানুষের গন্ধ আছে। আবার মৃত মানুষেরও গন্ধ আছে। অসুখের গন্ধ আছে। টাইফয়েড রোগীর গা থেকে এক রকম গন্ধ বের হয় আবার কালাজ্বর রোগীর গা থেকে অন্য রকম গন্ধ বের হয়।, রোগের ডায়াগনোসিসে এখন গন্ধ ব্যবহার করা না। কিন্তু আমি লিখে দিচ্ছি গন্ধ-নির্ভর ডায়াগনোসিস শুরু হবে। প্রাচীন ভারতের দুই মহান চিকিৎসক চরক এবং শুশ্রুত দুজনই রোগের ডায়াগনোসিসে গন্ধের গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও দাবি করতেন তিনি রোগের গন্ধ পেতেন।

জোবেদ আলি স্যারের মাথা কিঞ্চিৎ খারাপ ছিল। একদিন ভালোমানুষের মতো ক্লাস নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একগাদা ডরমিকম ট্যাবলেট খেয়ে মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে নোট লিখে গেলেন। নোটটা অন্যদের মতো না। তিনি অন্যদের মতো লিখলেন না— আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী না। তিনি লিখলেন— 'আমার মৃত্যুর জন্যে সবাই দায়ী। আমি নিজেও দায়ী।'

ইমাম সাহেব কি এরকম কোনো কিছু লিখে রেখে গেছেন ? তার স্ত্রীর কাছে কোনো চিঠি ? তার দুই কন্যার কাছে আবেগের কিছু লাইন ?

ঘরে আসবাবপত্র খুবই অল্প। টেবিলের ওপর কিছু হাদিসের বই— মেশকাত শরীফ, বোখারি শরীফ। টেবিলের ড্রয়ারে কিছু চিঠি পাওয়া গেল। সবই ইমাম সাহেবের বড় মেয়ে সকিনার লেখা। কোনো চিঠিতেই ঠিকানা নেই। অন্যের চিঠি পড়ার মানসিকতা আনিসের নেই— তারপরেও একটা চিঠি পড়ে ফেলল। সকিনা তার বাবাকে লিখেছে—

> আপনি শরীরের দিকে খিয়াল রাখিবেন। আপনার জন্য সবসময় আমার মন কাঁদে। প্রতি রাতে আজেবাজে খোয়াব দেখি। বাবাগো আমি আপনার পায়ে ধরি আপনি নিজের প্রতি যত্ন নেন। আপনার বুকে ব্যথা হয়— কেন আপনি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেন না ?...

আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ইমাম সাহেবের সঙ্গে তার অনেকবারই দেখা হয়েছে। তিনি তার বুকের ব্যথার কথা কখনো বলেন নি। মৃত্যু এক দিক দিয়ে ভালো— যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান। এই মানুষটা এখন আর বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে না।

মতিকে একা রেখে আনিস তার বাসার দিকে রওনা হলো। রাত অনেক হয়ে গেছে তারপরেও তাকে জহির খাঁ সাহেবের বাড়িতে যেতে হবে। তিনি জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আনিস মনে মনে আশা করছে সে গিয়ে দেখবে— জহির খাঁ বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মানুষটার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

জহির খাঁ জেগেই ছিলেন। তার চক্ষু রক্তবর্ণ। প্রচুর মদ্যপান করলে তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। আজ সারাদিন নানা উত্তেজনার ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এখন উত্তেজনা কমানোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। ডাক্তারকে দেখে তিনি আনন্দিত গলায় বললেন— তুমি ছিলা কোথায় ? বাসা তালা বন্ধ। তিনবার তোমার কাছে লোক পাঠায়েছি।

আনিস কিছু বলল না। সে ইমাম সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল এই কথাটা তার বলতে ইচ্ছা করছে না।

এখন আবার তোমার খোঁজে বদিরে পাঠায়েছি।

ডেকেছেন কী জন্যে ? শরীর খারাপ ?

শরীর কিঞ্চিৎ খারাপ কিন্তু তার জন্যে তোমাকে ডাকি নাই— গল্পগুজব করার জন্যে ডেকেছি। বস।

আনিস বসল। জহির খাঁ পানের বাটা থেকে পান নিয়ে মুখে দিতে দিতে বললেন— আজকে দিনটা যে পার করতে পারছি তার জন্যে আল্লার দরবারে শুকরিয়া। সকাল সাতটার সময় টিএনও সাহেব এসে বললেন— 'মন্ত্রী আসবে। আপনার বাড়িতে একটু চায়ের এন্তেজাম করতে হবে।' দেখ অবস্থা। এদিকে একজন আবার ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছে। ফাঁসিতে কারা ঝুলে ? মেয়েছেলে ঝুলে। বিবাহ হয় নাই পেটে সন্তান চলে এসেছে। তখন ফাঁসিতে ঝুললেও একটা কথা। আর তুই এক বুড়া— অন্যায় করেছিস, শাস্তি হয়েছে; ফুরায়ে গেছে। তার জন্যে ফাঁস নিতে হবে! ডাক্তার কি লাল পানি একটু খেয়ে দেখবে ? নার্ভ ঠাণ্ডা করে। হালকা করে দেই। বরফ দিয়ে খাও ভালো লাগবে।

জ্বি না। আপনি খান।

আমি তো খাচ্ছিই। এক পেগ করে খাই— মুখটা যখন পানশে হয়ে যায় তখন একটা পান খাই। মুখ ঠিক করি। তারপর আবার একটু। শোন ডাক্তার, তুমি হেনার ব্যাপারে কী করলা ?

কোন ব্যাপারে কথা বলছেন ?

তোমারে বললাম না, হেনার জন্যে পাত্র দেখ। খরচ আমার। ছবিও তো তুলে পাঠায়েছি। ছবি পাও নাই ?

ছবি পেয়েছি।

পাত্রের সন্ধান কর। পাত্র যদি ক্যাশ টাকা চায় তাও দিব।

আনিস চুপ করে রইল। জহির খাঁ গলা উঁচিয়ে বললেন— হেনা কই ? আমাদের খাওন দাও।

আনিস বলল, আমি এখন খাব না।

জহির খাঁ বললেন, খাবে না কেন ? খেয়ে এসেছ ?

জ্বি না। সারাদিন বাইরে ঘোরাঘুরি করেছি। গোসল করে তারপর খাব। আমি নোংরা শরীরে কিছু খেতে পারি না।

আমার এখানে গোসল কর। গরম পানি করে দিবে। সাবান দিয়ে ডলা দিয়ে গোসল কর। আমার ধোয়া লুঙ্গি আছে। অসুবিধা কিছু নাই।

তার দরকার নেই। আচ্ছা খাবার দিতে বলুন, গোসল পরে করব।

জহির খাঁ রাগী গলায় বললেন, গোসল পরে কেন করবা। এখনই করবা। হেনারে বলতেছি সে গরম পানি করে দিবে— শরীরে সাবান ডলে দিবে। তুমি তো বাইরের কেউ না। তুমি আমার নিজের লোক।

আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। নেশাগ্রস্ত মানুষের কোনো কথা ধরতে নেই। তারা কী বলছে না-বলছে তার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না— তারপরেও জহির খাঁ এইসব কী বলছেন? হেনা কেন গায়ে সাবান ডলে দেবে?

জহির খাঁ মুখের পান ফেলে দিয়ে তার বাঁ পাশে রাখা গ্লাস এক চুমুকে শেষ করে মুখে আরেকটা পান নিয়ে ঝুঁকে এসে বললেন— একা একা গোসলের সমস্যা জান? পিঠে সাবান দেওয়া যায় না। পিঠে সাবান দেবার জন্যে লোক লাগে। এতে দোষের কিছু নাই।

আনিস শান্ত গলায় বলল, আমি গোসল করব না। আপনি খাবার দিতে বলুন।

জহির খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেনাকে ডেকে খাবার দিতে বললেন।

হেনা মেয়েটাকে আজ আরো সুন্দর লাগছে। সে আজ শাড়ি পরে নি, জরি দেওয়া ঘাঘড়া জাতীয় পোশাক পরেছে। ঘাঘড়ার রং কালো বলে হেনার গায়ের রং খুব ফুটেছে। লম্বা বেণি করেছে। চোখে কাজল দিয়েছে। গায়ে গয়নাও আছে। প্রথম দিনে গায়ে কোনো গয়না ছিল না।

জহির খাঁ আনিসের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নেশাগ্রস্ত মানুষ এমন তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে পারে না। তাদের চোখের মণি ডাইলেটেড থাকে। আনিসের মনে হলো প্রচুর মদ্যপান করা সত্ত্বেও এই লোকটি মাতাল না। নিজের ওপর তার পূর্ণ দখল আছে। সে কি আনিসকে নিয়ে কোনো খেলা খেলছে? খেলোয়াড় মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। তাকে সব সময় খেলতে হয়। প্রতিপক্ষ না পেলে তারা প্রতিপক্ষ তৈরি করে নেয়।

ডাক্তার!

জ্বি।

তুমি আমার দিকে তাকায়ে আছ কেন? কী দেখ?

কিছু দেখি না।

ইমামের মৃত্যুর জন্য তুমি কি মনে মনে আমাকে দায়ী করছ?

না। প্রত্যক্ষভাবে আপনি দায়ী না। তবে পরোক্ষভাবে আপনার ভূমিকা আছে।

জহির খাঁ সোজা হয়ে বসলেন। শীতল গলায় বললেন— এখন যে কথাটা তুমি বললা— এরকম কথা আর বলবা না। একটা কথা সব সময় খেয়াল রাখবা। আমি দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং রাগী লোক। দুষ্টু লোক সাধারণত রাগী হয় না, তবে আমি রাগী। নাও খাওয়া দাওয়া কর।

হেনা হাত ধোয়ার পানি এনেছে। আনিস হাত ধোয়ার জন্যে বারান্দায় গেল। হাত ধুতে গিয়ে তার মনে হলো— প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

আনিস একা খাচ্ছে। প্লেটে খাবার তুলে দেয়ার জন্যে হেনা পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে গায়ে কোনো সুগন্ধি মেখেছে। খাবারের গন্ধের সঙ্গে এই গন্ধ যাচ্ছে না।

আয়োজন ভালো। মন্ত্রীর জন্যে করা আয়োজন খারাপ হবার কথা না। রুই মাছের বড় পেটি। পোলাও। খাসির মাংসের রেজালা। আস্ত মুরগির রোস্ট।

আনিস আরাম করেই খাচ্ছে। মনে হচ্ছে জ্বর নেমে গেছে। জ্বর নেমে গেলে খুব খিদে পায়।

ডাক্তার!

জ্বি।

খানা কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে।

গন্যমান্য সবাইরে বলেছিলাম। সবাই এসেছিল, শুধু একজন আসে নাই। বল দেখি কে আসে নাই?

বলতে পারছি না।

আজিজ মিয়া আসে নাই। খবর নিয়েছি সে গিয়েছে গৌরীপুর। গৌরীপুর কেন গিয়েছে জান?

জ্বি না।

আড়ং-এর জন্যে ষাঁড় কিনতে গিয়েছে। আমার সাথে পাল্লা দিতে চায়। আমি ষাঁড় কিনেছি তারও ষাঁড় কিনা লাগবে। দেখি সে কি ষাঁড় কিনে।

জহির খাঁ আরেকটা পান মুখে দিলেন।

ইমাম সাহেবের কবর হলো তার পরদিন সন্ধ্যায়। কবর ঠিক না, গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দেওয়া। মধ্যনগর গ্রামের হুজুর ফতোয়া দিলেন— অপঘাতে মৃত্যুর জানাজার বিধান নাই। লাশ কবরে নামানোর সময় অনেকেই চোখের পানি ফেলে। ইমাম সাহেবের ক্ষেত্রে শুধু মতি ভেউ ভেউ করে কিছুক্ষণ কাঁদল। গাঁজার নেশার কারণে ঘটনাটা ঘটল। ছয় পুরিয়া শেষ হবার পর সে আরো চারটা পুরিয়া এনেছে। এবারে দাম বেশি পড়েছে। চার পুরিয়ার জন্যে পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে। টাকাটা সে পেয়েছে ইমাম সাহেবের তোষকের নিচে।



ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট।

পৌঁছার কথা চারটায়, পৌঁছল ছ'টায়। নবনীর খুব বিরক্তি লাগছিল। তার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। কামরায় আর যারা আছে তাদের মনে হচ্ছে কারোরই টিকিট নেই। একজন আবার উঠেছে ছাগল নিয়ে। ট্রেনের বাথরুমের দরজা বন্ধ হয় না। মাঝে মাঝে এমন শব্দ হয় মনে হয় দরজা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে। মেজাজ খারাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে ট্রেন থামল। নবনী ট্রেনের জানালা দিয়ে মাথা বের করে হঠাৎ করেই মুগ্ধ হয়ে গেল— কী সুন্দর দিন! পিচকারি ভর্তি হলুদ রঙ কেউ যেন বাতাসে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আকাশের মেঘ সূর্যের আলোকে কিছু একটা করেছে। দিনের শেষে আলো যেখানেই পড়ছে সোনা রঙ হয়ে যাচ্ছে। রঙের গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। নবনীর মন খারাপ হলো এই ভেবে যে তার সঙ্গে কেউ নেই। কেউ থাকলে কিশোরীদের মতো চেঁচিয়ে বলতে পারত— দেখ দেখ কী সুন্দর! সুন্দর কিছু দেখলেই অন্যকে দেখাতে ইচ্ছা করে।

আরে আরে আফা না?

নবনী তাকাল। প্লাটফরম থেকে দৌড়ে তার দিকে কে যেন আসছে! গোলগাল মুখ, মাথা পরিষ্কার করে কামানো। মনে হচ্ছে আজই কামিয়েছে— চকচক করছে। পরনে লুঙ্গি, পায়ে রবারের জুতা। গায়ে ইস্ত্রি করা টি-শার্টে লেখা University of California. লোকটি দাঁত বের করে এমনভাবে হাসছে যেন নবনী তার দীর্ঘদিনের পরিচিত, অথচ নবনী আজই মানুষটাকে প্রথম দেখছে।

আফা আমারে চিনেছেন? আমি মতি। আপনি যান কই?

এখানেই নামব।

নামলে নামেন। জানালা দিয়া বেদিশার মতো চাইয়া আছেন। আমি ভাবি ঘটনা কী? আমরার আফা যায় কই? ট্রেন ছাইড়া দিব আফা।

আমি কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি না।

মতি আনন্দিত গলায় বলল, মাথা কামাইছি বইল্যা চিনতে পারতেছেন না। মাথায় উকুন হইছিল। মাথা কামাইয়া সোডার পানি দিয়া ধুইয়া উকুনের বংশ শেষ করছি। আফনে মনে হয় এখনো চিনেন নাই। ইয়াদ কইরা দেখেন প্রথমবার যখন আসছেন ডাক্তার সাবের কাছে আপনেরে কে নিয়া গেছিল ?

ও আচ্ছা। মনে পড়েছে। তখন তোমার গাল ভর্তি দাড়ি ছিল।

এই তো চিনেছেন। দাড়িতেও উকুন হয়েছিল। উকুন আমারে ভালো পায়। নামেন আফা, নামেন। জিনিসপত্র কী আছে দেখায়ে দেন।

মতি লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ল। তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। আজ ট্রেন ফাঁকা। মতি তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে ট্রেন যখন ফাঁকা থাকে যাত্রীরা ধীরে সুস্থে নামে তখনই জিনিসপত্র ফেলে যায়। প্রচণ্ড ভিড়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না।

আফা আপনে যে আসবেন ডাক্তার সাব জানে ?

আসব যে জানে। কবে আসব জানে না।

মতি চিন্তিত মুখে বলল, ঘরে বাজার আছে কি-না কে জানে! গিয়া হয়তো দেখবেন দুইটা আলু একটা পিয়াঁজ ছাড়া কিছু নাই। মহা চিন্তার বিষয় হইল।

নবনী বলল, মতি তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি দেখে শুনে মালগুলো নামাও। ঐ প্যাকেটে বই আছে। প্রচণ্ড ভারি, সাবধানে নামাও।

আফা আপনে নিশ্চিন্ত মনে নিচে গিয়া বসেন। আমার দেখা পাইছেন আর চিন্তা নাই।

নবনী ট্রেন থেকে নামল। পিচকিরি দিয়ে হলুদ রঙ ছোঁড়ার ব্যাপারটা এখনো ঘটছে। রঙ আরো গাঢ় হচ্ছে। তার কাছেই এ রকম লাগছে, না অন্য সবার কাছেই লাগছে সে বুঝতে পারছে না। ট্রেন থেকে যারা নামছে তাদের কাউকেই মুগ্ধ চোখে এদিক ওদিক তাকাতে দেখা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ যদি ট্রেনে তার সঙ্গে আসতেন তাহলে কী করতেন ? চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতেন ? হাত বাড়িয়ে হলুদ আলো ছোঁয়ার চেষ্টা করতেন ? প্লাটফরমে নেমে স্যুটকেসের ওপর বসে কাগজ কলম নিয়ে গান কিংবা কবিতা লিখতে বসতেন ?

'আলো ভাঙ্গার এই আলো।'

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন না।

এত বড় মানুষদের উচ্ছ্বাস মানায় না। তীব্র উচ্ছ্বাস কিশোরীদের এলাকা। কিশোরীদের এলাকায় কিশোরীদেরই মানায় অন্য কাউকে মানায় না। হাতের তালুতে তেতুলের আচার নিয়ে যখন কোনো কিশোরী চেটে চেটে খাবে তাকে মানাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মানাবে না।

আফা দেখেন জিনিস সব নামছে কিনা।

নেমেছে, থ্যাংক য়্যু। এখন একটা ভ্যানগাড়ি দেখ। চল রওনা দেই। এর আগের বার তুমিই তো আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলে ?

অবশ্যই আমি। হেইবার আফনের পরনে ছিল কচুয়া রঙের শাড়ি, লাল সুতার হিজিবিজি পাইর।

ঠিকই বলেছ, মতি শোন আমরা দেরি করছি কেন ?

পাঁচ দশ মিনিট বসতে হইব আফা।

বসতে হবে কেন ?

সইন্ধ্যা মিলইতাছে তো, এই সময় যাত্রা নাস্তি। সইন্ধ্যা মিলাউক। ফ্লাস্কটা দেন— গরম পানি আইন্যা দেই। চা বানায়ে খান। আপনের সঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম আছে না আফা ? গতবার ছিল।

এবারও আছে।

গরম পানি আইন্যা দিতাছি চা খান— এই ফাঁকে আমি ভ্যানগাড়ি ঠিক করি। দশ মিনিটের মামলা। আফা মাথাত কাপড় দেন— আজান হইতেছে।

নবনী মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিল। মতি লোকটাকে তার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। প্রথমবার যখন দেখা হয়েছে তখন এত ইন্টারেস্টিং মনে হয় নি। মনে হলে লোকটার কথা মনে থাকত। কোনো মানুষই সবসময় ইন্টারেস্টিং থাকে না। মাঝে মাঝে ইন্টারেস্টিং হয়। আজ এই মুহূর্তে মানুষটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। সন্ধ্যা মিলাবার পর হয়তো আর মনে হবে না।

মতি প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে। উত্তেজনার কারণ স্পষ্ট না। সে অতি দ্রুত গরম পানি জোগাড় করল। নবনীর সামনে গরম পানি ভর্তি ফ্লাস্ক নামিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল। খবর পেয়েছে বাজারে গরু জবেহ হয়েছে। ভাগা হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। এক শ টাকা ভাগা। এক ভাগ ডাক্তার সাহেবের জন্যে কিনে নেয়া যায়। এই অঞ্চলে গরুর মাংস সচরাচর পাওয়া যায় না। গরু জবেহ হয় শুধু হাটবার। আজ হাটবার না। ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এত দিন পর এসেছেন। আলু ভর্তা দিয়ে তিনি যদি রাতে ভাত খান তাতে

ডাক্তার সাহেবের ইজ্জত রক্ষা হবে না। ডাক্তার সাহেবের ইজ্জত রক্ষার চিন্তায় মতিকে খুব অস্থির মনে হলো।

নবনী যত্ন করে চা বানাচ্ছে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে সুগার কিউব, টি ব্যাগ বের হলো। ফ্লাস্কের লাল মুখটা হলো চায়ের কাপ। দূর থেকে কয়েকজন আগ্রহ নিয়ে তার চা বানানো দেখছে। তাদের জন্যে নিশ্চয়ই মজার দৃশ্য। একটা মেয়ে স্যুটকেসে বসে বেশ আয়েশ করে চা বানাচ্ছে এই দৃশ্য নিশ্চয়ই সচরাচর দেখা যায় না।

নবনী চায়ের কাপে চুমুক দিল। খেতে ভালো লাগছে। আরেকজন কেউ পাশে থাকলে হয়তোবা আরো ভালো লাগত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশে থাকলে অসাধারণ একটা ব্যাপার হতো। নবনী তাঁকে কী ডাকত ? গুরুদেব ? না। গুরুদেব মানে অনেক দূরের কেউ। পাশে বসে যিনি চা খাবেন তিনি দূরের কেউ না। নবনী মনে মনে কথা বলা শুরু করল। সময় কাটানোর এটা একটা ভালো বুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন।

কবি চা খেতে কেমন হয়েছে ?

ভালো।

'আলো ভাঙার আলো' এটা কবিতা না গান ?

কবিতা। তবে বাণীতে সুরের আশ্রয় হলেই তো গান। সেই অর্থে গানও বলতে পার।

শুধু প্রথম লাইন লিখলেন ? শেষ তো করলেন না।

প্রথম লাইনটা হলো বীজ। বীজ বপন করা হয়েছে— বৃক্ষ আসবে।

লাইনটার মানে বুঝতে পারলাম না— আলো ভাঙ্গার আলো— এর মানে কী ?

তোমার মনে যে অর্থ আসে সেটাই মানে। আরো সহজ করে বুঝিয়ে দেই— যখন আমি কোনো গান বা কবিতা লিখি তখন সেটা থাকে আমার। শুধুই আমার। যখন তুমি সেটা পড় বা গুনগুন করে গানটা গাও তখন সেটা সম্পূর্ণই তোমার। সন্তান জন্ম দেই আমি কিন্তু দত্তক দিয়ে দেয়া হয় তোমাদের।

কবি আপনাকে কি আরেক কাপ চা বানিয়ে দেব ?

না। প্রথম চায়ের স্মৃতিটি মাথায় রাখতে চাই। দ্বিতীয় কাপ হয়তো প্রথম বারের মতো ভালো হবে না। সুন্দর স্মৃতি থাকা ভালো না ? তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

আমার স্বামী গ্রামে ডাক্তারি করেন। আপনি চলুন না আমার সঙ্গে। কয়েকটা দিন থেকে আসবেন। আপনি গ্রামের পোস্ট মাস্টার নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলেন— আমার স্বামীকে নিয়েও একটা গল্প লিখতে পারবেন। গল্পটার নাম দেবেন 'গ্রাম চিকিৎসক'।

তোমার নিমন্ত্রণ মনে থাকল। কোনো এক সময় উপস্থিত হব।

আপনাকে ইস্টিশনে একা ফেলে চলে যেতে খুব খারাপ লাগবে।

আমার কোনো সমস্যা হবে না। হাঁটতে হাঁটতে দিনের আলো কীভাবে নিভে যায়, কী করে নির্জন স্টেশনে আঁধার নামে তাই দেখব। এই দৃশ্য একজীবনে কতবার দেখলাম তারপরেও প্রতিবারই নতুন মনে হয়— যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে...।

ইট বিছানো রাস্তা। মাঝে মাঝে ইট উঠে গেছে। রাস্তা গেছে ডেবে। ভ্যানগাড়িতে খুব ঝাঁকুনি হচ্ছে। ঝাঁকুনির চেয়েও বড় সমস্যা ধূলা উড়ছে। নবনীর ডাস্ট এলার্জি আছে। এলার্জির এটাক হলে হাঁচি উঠতে থাকবে। নবনী শাড়ির আঁচলে নাক মুখ ঢেকে রেখেছে। ইট বিছানো রাস্তায় এত ধূলা ওড়ার কথা না। কেন উড়ছে কে বলবে! রাস্তার দু'পাশে শিমুল গাছের সারি। একেকটা গাছ কাঁটাওয়ালা দৈত্যের মতো। রাস্তা পাহারা দিতে দৈত্যের সারি নেমেছে।

মতি ভ্যানগাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসেছে। তার হাতে কচুপাতায় মোড়া গরুর গোশত। জিনিসটা সে আড়াল করে রাখছে। অতিথিকে রাতে যে খাবার খাওয়ানো হবে সেই খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা অতিথির জন্যে অপমানসূচক। অতিথি যেন দেখতে না পায়।

মতি মাথা ঘুরিয়ে বলল, আফারে একটু সাবধান কইরা দেই। রাইতে ঘর থাইক্যা বাইর হইবেন না। মনে করবেন কার্ফু জারি হইছে। যদি বাইর হইতেই হয় হারিকেন হাতে বাইর হইবেন। টর্চ না, হারিকেন।

নবনী বলল, কেন? রাতে বের হলে সমস্যা কী?

সমস্যা আছে। ইমাম সাব বড় ত্যক্ত করতেছে।

মানে কী? পরিষ্কার করে বল। পরিষ্কার করে না বললে বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার সাব চিঠিতে কিছু লেখে নাই?

না।

মতি আগ্রহ নিয়ে গল্প শুরু করল। গলা নামিয়ে গোপন খবর ফাঁস করার

ভঙ্গিতে বলল— এইটা একটা মারাত্মক ইতিহাস। আমরার বিরাটনগরের ইমাম সাব তেতুলগাছে ফাঁস দিয়া মারা গেছিল।

নবনী বিস্মিত হয়ে বলল, কোন ইমাম সাহেব ? খুব সুন্দর চেহারা মাথায় পাগড়ি পরেন ?

জ্বি উনি।

উনাকে তো চিনি। আমার জন্যে পাকা তেতুল নিয়ে এসেছিলেন। উনি ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন ? কেন ?

সেইটা অন্য ইতিহাস, আরেক দিন শুনবেন। বর্তমান ইতিহাসটা শুনেন— ফাঁসের মরার জানাজা হয় না, এইটা তো আপনে জানেন। জানেন না ?

না, জানি না।

অপঘাতে মৃত্যুর জানাজা হওনের নিয়ম নাই। কবর খুইড়্যা বিসমিল্লাহ বইল্যা লাশ নামাইয়া দিতে হবে, এইটাই নিয়ম। ইমাম সাবেরে তাই করা হইল। প্রথমে অবশ্যি চেষ্টা করা হয়েছে দেশের বাড়িতে লাশ পাঠাইতে। দেশের বাড়িত ইমাম সাবের মেয়ে আছে, পরিবার আছে। তারার যা ইচ্ছা করব। দেশের বাড়ির ঠিকানা কেউ জানে না। এইদিকে ফাঁসির মরা সুরতহাল করা লাগে। সব মিলাইয়া বেড়া ছেড়া। লাশ গেল পইচ্যা— নাড়ি উল্টাইয়া যাওয়ার মতো বাস ছুটল। তখন সিদ্ধান্ত হইল জানাজা ছাড়াই তেতুল গাছের নিচে কবর হইব।

তারপর ?

কবর হইল— শুরু হইল ইতিহাস। বিরাটনগরের কোনো মানুষ এখন আর রাইতে একলা বাইর হইতে পারে না। কেউ যদি একলা বাইর হয়— পিছন থাইক্যা ইমাম সাব তারে চিকন গলায় ডাক দেয়।

নবনী অবাক হয়ে বলল, যে মরে গেছে সে পেছন থেকে ডাক দিবে কীভাবে ?

এইটাই তো ইতিহাস। ইমাম সাহেব পিছন থাইক্যা ডাক দিয়া বলে, জনাব আমার জানাজাটা পড়েন। জানাজা ছাড়া কবরে শুইয়া আছি— বড় কষ্ট!

কী বল এইসব!

সত্য কথা বলতেছি আফা। যদি মিথ্যা বলি তাইলে যেন আমার মাথাত ঠাডা পড়ে। আমার যেন কলেরা হয়। গু মুতের মধ্যে যেন মইরা পইরা থাকি। আমারে এক রাইতে নিয়া পুসকুনিত ফেলছে।

ভ্যানগাড়ির চালক পেছন ফিরে বলল, ঘটনা সত্য। বিরাটনগরের কোনো মানুষ সইন্ধ্যার পরে ঘর থাইক্যা বাইর হয় না। পিসাব পায়খানাও ঘরের মধ্যে করে।

মতি বলল, হাতে আগুন থাকলে ভয়ের কিছু নাই। আগুন না থাকলে সমস্যা। এরা আগুন ভয় পায়। আগুন হইল ভূতের সাক্ষাত যম।

নবনী বলল, একটা মানুষ ভূত হয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে?

মতি বলল, ভয় না আফা, হে চায় তার জানাজা হউক এর বেশি কিছু না। তবে আজিজ মিয়ারে এক রাইতে দৌড়ান দিছে। আজিজ মিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে পুসকুনির মধ্যে লাফ দিয়া পড়ছে। চিৎকার শুরু করছে মাঝপুকুর থাইক্যা। লোকজন হারিকেন দা বল্লম নিয়া তারে উদ্ধার করছে। এখন আজিজ মিয়া আর গেরামে থাকে না। বাজারে থাকে। বাজারে তার দুইটা দোকান আছে। তার থাকার অসুবিধা নাই। তার মতো অবস্থা তো অন্য সবের না। বাড়ি ঘর ছাইড়া যাইব কই?

আনিস ঘরে ছিল না। কলে গিয়েছে। বাড়িতে আছে সুজাত মিয়া। সে বলতে পারল না ডাক্তার সাহেব কলে কোথায় গিয়েছেন, কখন ফিরবেন।

মতি বলল, আফা কোনো দুশ্চিন্তা নাই। ডাক্তার সাব না ফিরা পর্যন্ত আমি আছি। ডাক্তার সাবের হাতে আপনেরে সোপার্দ কইরা দিয়া তারপরে বিদায়।

নবনী বলল, তোমার থাকার দরকার নেই। তুমি তোমার কাজে যাও। আমার অসুবিধা হবে না।

আমি পাহারা দেই। বাংলা ঘরের বারান্দাত বইস্যা থাকি। ভয় টয় যদি পান। সময় খারাপ। এখন আবার চলতাছে কৃষ্ণপক্ষ।

কৃষ্ণপক্ষ হোক বা শুক্লপক্ষ হোক তোমাকে পাহারা দিতে হবে না। আমার ভয় কম। তেলাপোকা আর টিকটিকি এই দু'টা জিনিস ছাড়া কোনো কিছুকেই ভয় পাই না।

মতির মন খারাপ হয়ে গেল।

ভ্যানগাড়ি চলে গেছে। এখন নান্দাইল রোডে যেতে হলে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে। তাছাড়া সেখানে গিয়েইবা করবে কী? বাতাসীর কাছে যাওয়া যাবে না। বাতাসী জেনে গেছে মতি বিরাটনগর হাইস্কুলের শিক্ষক না। এতে সে খুবই রেগেছে। আগে সে মতিকে 'আপনি আপনি' করে বলত। ঘটনা জানার পর

থেকে সে 'তুই তুকারি' করছে। এটিও অত্যন্ত অপমানসূচক ব্যাপার। বাতাসী চোখ কপালে তুলে সাপের মতো হিসহিস শব্দ করতে করতে বলেছে— তুই না কুলি ? ইস্টিশনে কুলির কাম করস। আমারে বলছস তুই মাস্টর।

মতি উদাস গলায় বলেছে, তুই তোকারি বন কর।

হারামজাদা মিসকুর। তুই ভাবছস কী ?

মতি অতি বিরক্ত হয়ে বলেছে, আমি যেমন কুলি তুইও তেমন বাজারের নটি বেটি। কাটাকাটি।

তুই বাইর হ। বাইর হ কইলাম।

মতি বের হয়ে চলে এসেছে। এরপর আর বাতাসীর ঘরে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। মতি যা পারে তা হলো নিজের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারে— সেখানেও সমস্যা আছে। তার বাড়ি মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি। নিশি রাতে ইমাম সাহেব এসে যদি বলেন— মতিরে, আমার জানাজার ব্যবস্থা কর। তখন কী হবে ? মতি মন খারাপ করে রাস্তায় নামল।

নবনী সুজাত মিয়াকে গরম পানি করতে বলল। বালিতে শরীর কিচকিচ করছে। গরম পানিতে ভালো গোসল দিতে হবে। আগের বারে গোসলখানা বলে আলাদা কিছু ছিল না। এখন গোসলখানা বানানো হয়েছে। চৌবাচ্চা ভর্তি পানি। চৌবাচ্চা ব্যাপারটা ঢাকা শহর থেকে উঠেই গেছে। নবনী অনেক দিন পর চৌবাচ্চা দেখল। চৌবাচ্চা দেখলেই চৌবাচ্চার অঙ্কের কথা মনে পড়ে। একটা নল দিয়ে পানি আসছে, অন্য একটা নল দিয়ে পানি চলে যাচ্ছে। কত সময়ে চৌবাচ্চাটি শূন্য হয়ে যাবে ?

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়— অঙ্কের ধরনও বদলাবে। একটা সময়ে অঙ্ক বইতে চৌবাচ্চার অঙ্ক বলে কিছু থাকবে না। নতুন ধরনের অঙ্ক থাকবে— মোবাইল ফোন নিয়ে অঙ্ক। 'যদি একটি মোবাইল টেলিফোনে ইনকামিং চার্জ প্রতি মিনিটে দুই টাকা হয় তবে... ।'

নবনীর ভালো লাগছে। ভ্যানগাড়ির ঝাঁকুনিতে শরীরের কলকব্জা নড়ে গিয়েছিল— এখন মনে হচ্ছে জায়গামতো বসছে। চৌবাচ্চার পানি হিম শীতল, শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বাড়িঘর সুন্দর করে গোছানো এটা দেখতেও ভালো লাগছে। খাটের চাদর টানটান করে বিছানো। খাটের পাশের টেবিলে টেবিল ল্যাম্প। আগের বার

টেবিল ল্যাম্প ছিল না। নতুন কেনা হয়েছে। আনিস চিঠিতে লিখেছিল, ঘরে ইলেকট্রিক তার ছিড়ে গেছে বলে ঘরে ফ্যান ঘুরছে না, বাতি জ্বলছে না। নবনী দেখল ইলেকট্রিসিটি আছে। মাথার ওপর দুর্বলভাবে ফ্যান ঘুরছে।

রাত অনেক হয়েছে। ঘরের বারান্দায় নবনী বসে আছে। বারান্দায় আলো নেই। খোলা জানালা থেকে কিছু আলো এসে পড়েছে তার পায়ে। নবনীর কোলে একটা মোটা বাঁধানো বই। বই পড়ার মতো আলো নেই। নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে বই হাতে রাখা। মাঝে মাঝে পাতা ওল্টানো। চারদিক অসম্ভব নীরব। রাত আটটার দিকে ঝিঁঝি ডাকছিল। এরাও চুপ করে গেছে। শহরের কোলাহল থেকে হঠাৎ এ ধরনের শব্দহীনতা মনের ওপর চাপ ফেলে। নবনীর কিছু ভালো লাগছে না। কিছুক্ষণ আগেও ক্ষিধে পাচ্ছিল, এখন সে ক্ষিধেও নেই। মতি নামের মানুষটাকে বিদেয় করে দেয়া ঠিক হয় নি। সে থাকলে তার সঙ্গে গল্প করা যেত।

আনিস ফিরলেও খুব যে গল্প করা যাবে তা না। আনিস চুপচাপ ধরনের মানুষ। কথা বললে মন দিয়ে কথা শুনবে। নিজ থেকে আগ বাড়িয়ে কখনোই কিছু বলবে না। সে যে কৌতূহলশূন্য মানুষ তাও না। তার কৌতূহল আছে, কিন্তু কৌতূহলের কোনো প্রকাশ নেই। এর কোনো মানে হয়? মানুষের ভেতর যা থাকবে তার প্রকাশও থাকা উচিত। আবেগ থাকবে অথচ আবেগের প্রকাশ থাকবে না, এটা কেমন ব্যাপার?

সুজাত মিয়া কয়েকবার এসে নবনীকে দেখে গেছে। তাকে বলা হয়েছে সে যেন খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ে। সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়েছে কিন্তু খেতে বসে নি— ঘুরঘুর করছে।

যে যেমন সে তার আশেপাশের মানুষগুলোও সে রকম জোগাড় করে। সুজাত মিয়ার মুখে কোনো কথা নেই। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সে চেষ্টা করে হ্যাঁ-না বলে জবাব দিয়ে দিতে। মনে হচ্ছে তাকে কথা না-বলার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।

রাস্তায় কাকে যেন দেখা যাচ্ছে। টর্চের আলো ফেলে এগুচ্ছে। মানুষটার গায়ে চাদর। চাদরে মাথাও ঢাকা। আনিস ফিরছে কি? তার সাইকেল চুরি গেছে। হেঁটে হেঁটেই ফেরার কথা। এই গরমে সে মাথায় চাদর দিয়ে আছে কেন? শরীর খারাপ করেছে কি? ডাক্তারদের শরীর খারাপ শুনতে খুব হাস্যকর লাগে, কিন্তু ডাক্তারদের শরীর খারাপ হয়— ভালোমতোই হয়। নবনী বুঝতে পারছে না, সে বারান্দায় বসে থাকবে না-কি আনিসকে চমকে দেবার জন্যে কিছু

করবে ? বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের কাঁঠাল গাছের আড়ালে চলে যাওয়া যায়। তারপর হঠাৎ আনিসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বিকট চিৎকার দেয়া। একঘেয়েমির জীবনকে ইন্টারেস্টিং করার জন্যে মাঝে মাঝে লবণ এবং গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে হয়। বেঁচে থাকা ব্যাপারটার মধ্যেই একঘেয়েমি আছে। যে মানুষটা সত্তর বছর বাঁচে তাকে এই দীর্ঘ সত্তর বছর ধরেই যথানিয়মে রাতে ঘুমুতে যেতে হয়। সত্তুর বছর প্রতিদিন তিনবেলা খেতে হয়। ক্লান্তিকর একটা ব্যাপার। নিম্নশ্রেণীর কীট পতঙ্গের বেঁচে থাকার মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে। সামান্য পিঁপড়া এক সময় পাখা পেয়ে আকাশে ওড়ে। কুৎসিত দর্শন শুয়োপোকা একদিন সুন্দর প্রজাপতি হয়। মানুষের মধ্যে এরকম কিছু নেই— মানুষ বদলায় না।

টর্চ হাতে লোকটা অনেক কাছে এসে গেছে। সে আনিস না, মতি। কোত্থেকে চাদর জোগাড় করে হন হন করে যাচ্ছে। নবনী কোলের ওপর রাখা বইটার পাতা উল্টাল। তার সামান্য ভয় ভয় লাগছে। চাদর গায়ে মানুষটাকে দেখে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনে হয়েছিল— বিরাটনগরের ইমাম সাহেব। সেই মানুষটাও ছিল মতির মতো ছোটখাট।

আনিস গিয়েছে মিঠাপুরে।

বিরাটনগর থেকে মিঠাপুরের দূরত্ব সাত মাইল। গ্রামের হিসাবে দুই ক্রোশের সামান্য বেশি। বর্ষাকালে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো। ইনজিনের নৌকা চলে। সমস্যা হয় শীতের সময়। শুকিয়ে যাওয়া বিলের ভেতর দিয়ে হাঁটা পথ। গ্রামের মানুষদের জন্যে হাঁটা কোনো বড় ব্যাপার না। তারা মাইলের পর মাইল নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটতে পারে। আনিস পারে না। তার কষ্ট হয়। পা ফুলে যায়। সাইকেল চুরি যাওয়াতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। সে অনেকবারই ভেবেছে এমন গভীর গ্রামে রোগী দেখতে যাবে না। রোগীদের হাসপাতালে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। হাসপাতালের ব্যাপারে এখনো গ্রামের মানুষদের ভেতর প্রবল ভীতি কাজ করছে। হাসপাতালে যাওয়া মানে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়া। তাদের হিসেবে হাসপাতাল থেকে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা শূন্য।

ডাক্তার বাড়িতে নিয়ে আসার পেছনে আরেকটি মানসিকতা কাজ করে। ক্ষমতা প্রতিপত্তি জাহির করার মানসিকতা।— হে গ্রামবাসী তোমরা দেখ, পাস করা এমবিবিএস 'ডাক্তার বাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

আনিস যে রোগী দেখতে যাচ্ছে তার বয়স অল্প— এগারো বারো বছরের কিশোর। নাম কাদের। হঠাৎ তার শরীর ফুলে গেছে। কথা বলতে পারছে না, কাউকে চিনতে পারছে না। অন্য ডাক্তার তার চিকিৎসা করছিলেন। চিকিৎসায় কোনো ফল হয় নি বরং রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। সেই ডাক্তার শেষ কথা বলে এসেছেন— রোগী ঢাকায় নিতে হবে। রোগীর আত্মীয়স্বজন রোগীকে ঢাকায় নিতে প্রস্তুত। কিন্তু শেষ চিকিৎসা হিসেবে আনিসকে দেখাতে চায়। অল্প বয়স্ক গম্ভীর ধরনের এই ডাক্তার সম্পর্কে নানান কথা শোনা যায়। এই ডাক্তারের সাইকেলের ঘণ্টা না-কি আজরাইল সহ্য করতে পারে না। আজরাইলের কানে যন্ত্রণা হয়। সে দূরে সরে যায়। মরণাপন্ন রোগী বিছানায় উঠে বসে চিকন গলায় বলে— কৈ মাছের সালুন দিয়া ভাত খামু।

রোগীর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছার পর রোয়াইল বাজারের এমবিবিএস ডাক্তার সাইফুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আনিসের দেখা হলো। সাইফুদ্দিন সাহেব মোটর সাইকেলে করে এসেছেন। মোটর সাইকেলের কেরিয়ারে ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে তার এসিসটেন্ট বসা। এসিসটেন্টের মুখও গম্ভীর। তাকে রোগী দেখার জন্যে আনা হয়েছে। তিনি আনিসকে দেখে ভুরু কুঁচকে ফেললেন। মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে আনিসকে হাতের ইশারায় এক পাশে নিয়ে গেলেন। গোপন কিছু কথা বলবেন— এইসব গোপন কথা রোগীর বাড়ির যে দু'জন আনিসকে নিয়ে আসছে তাদের শোনানো যাবে না।

সাইফুদ্দিন সাহেব গলা নামিয়ে বললেন— রোগী দেখার কিছু নাই। শেষ অবস্থা। ডাক্তার শিলপাটায় বেটে শরীরে মাখিয়ে দিলেও কিছু হবে না।

আনিস বলল, হয়েছে কী?

পানি এসে শরীর ফুলে গেছে। শ্বাসনালিও ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে— ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। রাতটা টিকবে না। ভিজিটের টাকা নিয়ে দ্রুত চলে আসবেন। অঞ্চলটা খারাপ। ডাক্তারের উপস্থিতিতে রোগী মারা গেলে খবর আছে।

আনিস চুপ করে রইল। সাইফুদ্দিন সাহেব গলা আরো নামিয়ে এনে বললেন— ভিজিটের টাকা নিয়ে এরা ঝামেলা করে নাই। দুইশ টাকা ভিজিট চেয়েছিলাম দিয়েছে। মোটর সাইকেলের তেলের খরচ দিয়েছে। আর আমার এসিসটেন্টকে দিয়েছে কুড়ি টাকা। এদের পয়সাকড়ি আছে।

আনিস বলল, চিকিৎসা কী করেছেন?

সাইফুদ্দিন সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন— চিকিৎসার কিছু নাই। আপনে

যান। দেখলেই বুঝবেন। এখন একমাত্র চিকিৎসা দোয়া দরুদ। একটা স্যালাইন দিতে পারলে ভালো হতো। গ্রামের মানুষ স্যালাইন দেয়াটা বড় চিকিৎসা মনে করে। স্যালাইন দিলাম না। দেড় দুই ঘণ্টা সময় দরকার। এর মধ্যে যদি রোগী মরে যায় আত্মীয়স্বজনরা বলবে ভুল চিকিৎসা করে মেরে ফেলেছি। কী দরকার?

রোগীর বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মেয়েরা কাঁদছে। বুঝাই যাচ্ছে রোগী মারা গেছে। গ্রাম অঞ্চলে মৃত্যুশোকের প্রাথমিক প্রকাশ অসম্ভব তীব্র। নিকটজনরা মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে বুকফাটা আর্তনাদ করতে থাকেন।

আনিস থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এই অবস্থায় রোগীর বাড়িতে না ঢোকাই ভালো। আনিস পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করল। তার সিগারেট খাবার অভ্যাস ছিল না। গ্রামে এসে এই অভ্যাস হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে অভ্যাস তত বাড়ছে।

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক লাঠিতে ভর দিয়ে এগুচ্ছেন। লুঙ্গি পরা খালি গা, কিন্তু তার এগিয়ে আসার ভঙ্গিতেই মনে হচ্ছে অতি প্রতাপশালী একজন। রোগীর দাদা বা এই স্থানীয় হবেন।

ডাক্তার সাব না?

জ্বি।

আপনের অনেক সুনাম শুনেছি। আমার আফসোস আপনেরে এরা শেষ সময়ে এনেছে। আপনে গিয়া রোগীর কাছে বসেন। লোকজনরে বলতে পারব— নাতির চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। তার মৃত্যুর সময়ও বড় একজন ডাক্তার তার বিছানার পাশে বসাইয়া রাখছিলাম।

আনিস হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল— চলুন।

মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব না। কিন্তু মৃত্যুকে সহনীয় করার চেষ্টা একজন ডাক্তারকে করতে হয়।

ঘর ভর্তি মানুষ। খাটের ওপর রোগী পড়ে আছে। নিঃশ্বাস নিতে তার ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে ট্রেসেকটমী করতে হবে। ফুসফুসে অক্সিজেন ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনি করতে হবে। দেরি করা যাবে না।

আনিস দ্রুত চিন্তা করছে— এলার্জিক কোনো রিএকশান কি? মাঝে মাঝে এলার্জি ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

এলার্জির কারণে শরীরে এভাবে পানি আসতে পারে না। কোনো সাইড এফেক্ট কি ? শরীরের পানি বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সবার আগে যা দরকার তা হলো— ছেলেটার নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা করা। এলার্জির চিকিৎসা করে শ্বাসনালির ফোলাটা একটু যদি কমানো যায়। শেষ চেষ্টা ট্রেসেকটমী। ইশ যদি অক্সিজেনের বোতল থাকত!

আনিস বলল, ঘর খালি করে দিন। গরম পানি দিন। একটা বড় চামুচ আনুন।

আনিস তার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে। তার মনে হচ্ছে স্কুলের স্পোর্টস হচ্ছে। একশ মিটার দৌড়ে সে নাম দিয়েছে। রেফারি হুইসেল দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রাণপণে দৌড়াতে হবে। তার সঙ্গে যে দৌড়াবে তার নাম মৃত্যু। দৌড়ে মৃত্যুকে হারাতে হবে।

একজন মহিলা গরুর মতো বড় বড় চোখে আনিসের দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু পর পর তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন। ডাক্তারের মনে হলো উনি ছেলের মা। অসংখ্য মহিলার মধ্যেও রোগীর মা'কে সব সময় আলাদা করা যায়।

আনিস মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি রোগীর গলায় ফুটো করব। ভয় পাবেন না। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

মহিলা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

দুই ঘন্টার মতো সময় পার হয়েছে।

রোগীর দাদা উঠোনে জলচৌকিতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁকে একজন দৌড়ে এসে বলল, কাদের ভালো আছে। শ্বাস কষ্ট কমেছে। পানি খাইতে চায়।

বৃদ্ধ বললেন, ডাক্তার সাব কী করতেছে ?

উনি সিগারেট ধরাইছেন। বারান্দাত খাড়াইয়া সিগারেট খাইতেছেন।

বৃদ্ধ বললেন, আমারে অজুর পানি দেও। অজু কইরা দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ব। দুইটা গরু জবেহ কইরা মেহমানি দেও, আমার মানত ছিল। আরেকটা কথা, ডাক্তার সাবরে ভিজিটের টাকা দিবা না। এইটাতে উনার অপমান হবে। বৌমারে বল ডাক্তারের পা ছুঁইয়া যেন সালাম করে।

বৃদ্ধ হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন।

নবনী, কখন এসেছ?

নবনী বই হাতে উঠে দাঁড়াল। প্রশ্নের জবাব দিল না। কিছু প্রশ্ন আছে— জবাব দিতে হয় না। প্রশ্নকর্তা জবাব পাবার আশায় প্রশ্ন করেন না। আনিসের এই প্রশ্নটাও সেই গোত্রের। জবাব দিলে ক্ষতি নেই, না দিলেও ক্ষতি নেই।

আনিস বলল, মিঠাপুর বলে একটা জায়গায় রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ— ওরা আমাকে রেখে দিতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস থাকি নি।

নবনী বলল, রোদে পুড়ে তুমি তো দেখি ঝলসে গেছ।

আনিস হাসতে হাসতে বলল, তুমি খুব সুন্দর হয়েছ। চুল কেটেছ— তাই না?

হুঁ।

পথে অসুবিধা হয়েছে? একা একা আস কেন? কাউকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হয়। এমন তো না যে তোমাদের বাড়িতে মানুষের অভাব।

নবনী হালকা গলায় বলল, একা আসি নি তো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নান্দাইল রোড স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। আমি তোমার এখানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। রাজি হন নি।

আনিস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নবনী গম্ভীর গলায় বলল, উনার মাথায় হঠাৎ করে গান এসে গেল বলে আমিও জোর করি নি। গানের একটা লাইনই এসেছে, অন্য লাইনগুলো আসে নি। লাইনটা হলো—

'আলো ভাঙার এই আলো।'

লাইনটা সুন্দর না?

আনিস বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কার সঙ্গে তোমার দেখা? কোন রবীন্দ্রনাথ?

জোড়াসাকোর রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরু।

আনিসের মুখের হতভম্ব ভাব আরো প্রবল হলো। নবনী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বলল— তুমি এমন কাঠখোট্টা হয়ে যাচ্ছ কীভাবে? ঠাট্টা বুঝ না। ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা করছিলে?

ইয়েস ডাক্তার সাহেব। তোমার চোখ মুখ শক্ত হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় তুমি রেগে গেছ।

না রাগি নি। তোমার মধ্যে ঠাট্টা করার প্রবণতা আছে এটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার ঠাট্টাগুলো অন্যরকম। হঠাৎ শুনলে ধাক্কার মতো লাগে।

নবনী বলল, গোসল করে এসো। খেতে বসব। আমার ক্ষিধে চলে গিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। এখন যদি চলে যায় আর ফিরে আসবে না। আচ্ছা শোন, তোমাদের এখানকার ইমাম সাহেব না-কি ভূত হয়ে লোকজনদের ভয় দেখাচ্ছেন? মতিকে শুনলাম তাড়া করে পুকুরে নিয়ে ফেলেছে। সে আমাকে বলছিল।

আনিস চুপ করে রইল। নবনী বলল, হ্যাঁ না একটা কিছু বল।

আনিস বলল, এ রকম কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

তোমাকে উনি কখনো তাড়া করেন নি?

না। এই প্রসঙ্গটা থাক।

থাকবে কেন?

সব আলাপ এক সঙ্গে করে ফেললে কীভাবে? কিছু তোলা থাক।

থাক, তোলা থাক।

নবনীর ঘুম পাচ্ছে। সে হাই তুলতে তুলতে বলল, তোমার টেবিলের ড্রয়ারে দেখলাম একটা মেয়ের কয়েকটা ছবি। খুবই সুন্দর মেয়ে। সে কে?

জহির খাঁ সাহেবের ভাইস্তি।

তোমার ড্রয়ারে তার ছবি কেন?

চেয়ারম্যান সাহেব মেয়েটার বিয়ে দিতে চান। আমাকে পাত্র খুঁজতে বলেছেন। এইসব ছবি পাত্রপক্ষকে দেবার জন্যে।

এই মেয়ের পাত্র খোঁজার দরকার কী? পাত্ররাই তাকে খুঁজবে।

তা ঠিক।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে রাত এগারোটা বেজে গেল। আনিস বলল, টায়ার্ড হয়ে এসেছ শুয়ে পড়। আজ গরম কম আছে— ভালো ঘুম হবে। এই ক'দিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তুমি তো আবার গরম একেবারেই সহ্য করতে পার না।

নবনী বলল, আমি শীতও সহ্য করতে পারি না। দুটাই আমার অসহ্য। তবে গরমটা বেশি অসহ্য। তোমাদের এখানে মশা কেমন?

মশা নেই।

তাহলে মশারি খাটাবে না। মশারির ভেতর আমার দমবন্ধ হয়ে যায়। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

বেশ তো মশারি খাটাব না।

তোমার কাছে আরেকটা অনুরোধ আছে।

কী অনুরোধ ?

আগে বল অনুরোধ শুনে রাগ করবে না।

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, এমন কী অনুরোধ আছে যা শুনে রাগ করতে পারি ?

রাগ করার সম্ভাবনা আছে বলেই তো বলছি। বল রাগ করবে না।

রাগ করব না।

নবনী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অনুরোধটা হচ্ছে আমি একা ঘুমুতে যাব। দু'জন আলাদা শোব।

আনিসের মনে হলো নবনী ঠাট্টা করছে। সে বিচিত্র ধরনের ঠাট্টা করে— তার এই কথাটাও ঠাট্টা। আনিস যখন বলবে, আচ্ছা আলাদা খাটে ঘুমাও; তখনি নবনী খিলখিল করে হেসে উঠবে।

নবনী বলল, গম্ভীর হয়ে আছ কেন ? কিছু বল।

আনিস বলল, কোনো সমস্যা নেই। আলাদা খাটে ঘুমাও।

নবনী বলল, থ্যাংক য়্যু।

তাকে দেখে মনে হলো সে এক ধরনের টেনশান বোধ করছিল, এখন আর সেই টেনশান নেই। সে নিশ্চিত বোধ করছে।

নবনী বলল, রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমি হালকা লিকার দিয়ে এক কাপ চা খাই। তুমি খাবে ?

আনিস বলল, না।

নবনী বলল, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। রাগটা চেপে আছ।

আমি রাগ করি নি। তুমি এই খাটে শোও। আমি পাশের ঘরে আছি।

ঐ ঘরে তো ফ্যান নেই। ঘুমুবে কীভাবে ?

আমার অভ্যাস আছে।

নবনী বলল, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে যদি চিৎকার করতে থাকি তুমি কিন্তু ধাক্কা

দিয়ে আমার ঘুম ভাঙাবে।

দুঃস্বপ্ন কি রোজ রাতেই দেখ ?

হ্যাঁ। আজ যে দেখব এটা প্রায় নিশ্চিত। আজ হয়তো দেখব ইমাম সাহেব আমাকে তাড়া করছেন।

আনিস বলল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাও। ঘুম গাঢ় হবে, স্বপ্ন দেখবে না।

নবনী ওষুধ খেয়ে সহজ গলায় বলল, ঘুম না আসা পর্যন্ত এসো কিছুক্ষণ গল্প করি।

আনিস বলল, বেশ তো গল্প কর।

তুমি কি কিংবদন্তী ডাক্তার হয়ে গেছ ? লোকজন তোমাকে নিয়ে নতুন কোনো গল্প বানিয়েছে ? নাম কি এখনো 'সাইকেল ডাক্তার' আছে ? সাইকেল নেই, 'সাইকেল ডাক্তার' নাম থাকার তো কথা না।

আনিস কিছু বলল না। নবনী বলল, আমি বড় মাছ রান্না করা শিখেছি। একদিন বড় মাছ আনিও তো। রান্না করে খাওয়াব।

আচ্ছা।

রান্না শিখেছি তোমার মা'র কাছে। ও বলতে ভুলে গেছি— এখানে আসার আগে তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তাঁরা ভালো আছেন। তবে দু'জনের মধ্যে আবার ঝগড়া হয়েছে। কথা বন্ধ। তোমার বাবা বাসায় খাচ্ছেনও না। হোটেল থেকে খেয়ে আসছেন।

আনিস বলল, এটা নতুন কিছু না।

নবনী বলল, ওনাদের ঝগড়া মান অভিমান আমার কিন্তু খুব পছন্দ। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার এরকম মজার ঝগড়া হবে না।

আনিস বলল, তা হবে না। আমি তাদের মতো না।

তুমি কী রকম ?

একটু আলাদা।

কী রকম আলাদা ?

আনিস জবাব দিল না। তার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। নবনীর সামনে সিগারেট খাওয়া যাবে না। সে উঠে পড়ল। নবনী বলল, কোথায় যাও ?

তুমি ঘুমানোর চেষ্টা কর। আমি একটা সিগারেট খেয়ে আসি।

আমার সামনেই খাও। কিছু হবে না।

আনিস বলল, না।

নবনীর দুঃস্বপ্নটা শুরু হয়েছে। শুরুটা সুন্দর। ঘুমের মধ্যেই নবনী বুঝতে পারছে এই সুন্দরের শেষটা ভালো না। শেষটা ভয়ঙ্কর। শেষটা সে আন্দাজও করতে পারছে। নবনী হাঁটছে রেললাইনের স্লীপারে পা রেখে রেখে। সামনেই ব্রীজ, যাচ্ছে ব্রীজের দিকে। চারদিক খুব সুন্দর। সবুজে সবুজ হয়ে আছে। বনজঙ্গল ঝোপ ঝাড় কিচ্ছু নেই। দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে না। আকাশ দেখা যাচ্ছে। সেই আকাশের রঙও হালকা সবুজ। নবনী বুঝতে পারছে, ব্রীজের ওপর ওঠা মাত্রই দুঃস্বপ্ন শুরু হবে। উল্টো দিক থেকে ট্রেন আসতে শুরু করবে। সে তখন না পারবে ব্রীজ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নদীতে পড়তে, না পারবে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে। সবচে' ভালোবুদ্ধি হচ্ছে এক্ষুণি ট্রেনের লাইন থেকে সরে দাঁড়ানো। সেটাও সম্ভব না। স্বপ্নে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। স্বপ্ন হলো পরিপূর্ণ সমর্পণ। যিনি স্বপ্নে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি নবনীকে অবশ্যই ব্রীজে নিয়ে তুলবেন। মাঝামাঝি পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে যাবেন, তারপর উল্টো দিক থেকে কোনো এক আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে দেবেন। সেই ট্রেন দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝড়ের গতিতে আসতে শুরু করবে। স্বপ্নের নিঃসঙ্গ জগতে তাকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না।

নবনী এখনো ব্রীজ পর্যন্ত পৌঁছায় নি, তার আগেই সে ঘুমের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল— আমাকে বাঁচাও। প্লীজ আমাকে বাঁচাও। ট্রেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নবনী ছটফট করছে। তার ঘুম ভাঙানোর জন্য কেউ আসছে না।



নবনীর ঘুম ভাঙ্গল অনেক বেলায়।

ঘরে ঝলমলে রোদ। জানালা ভেঙে পায়ের পাতায় রোদ পড়েছে। পা চিড়বিড় করছে। শরীরে আরামদায়ক আলস্য। রোদ থেকে পা সরিয়ে নিতেও আলসেমি লাগছে। রাতে রেললাইন ঘটিত দুঃস্বপ্নের পরেও ঘুম যে শুধু ভালো হয়েছে তা-না, খুব ভালো হয়েছে। ঘুমের ট্যাবলেট চমৎকার কাজ করেছে। ট্যাবলেটের নাম ধাম জেনে নিতে হবে।

সকালে জেগে ওঠার পরের দশ মিনিটের আলসেমির আনন্দের সীমা নেই। নবনীর খাটে উঠে বসতেও ইচ্ছা করছে না। কেউ যদি টেনে বিছানায় বসিয়ে দিত! কাজের ছেলেটার নাম মনে পড়ছে না। তাকে ডেকে ফুটন্ত পানির কথা বলতে হবে। এই ছেলে চা কেমন বানায় এখনো জানা হয় নি। দিনের প্রথম চা-টা খারাপ হলে পুরো দিনটাই নষ্ট হবে। দিনের প্রথমটা এবং রাতে ঘুমুতে যাবার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি— নবনীর জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে যে ক'দিন এখানে থাকবে— ঠাণ্ডা পানির সমস্যা হবে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ঠাণ্ডা পানি পাওয়া যাবে না, এটা ভেবে নবনীর এখনি খারাপ লাগছে।

আনিস যে বাড়িতে নেই এটা বুঝা যাচ্ছে। সিক্সথ সেন্স কি-না কে জানে! কে বাড়িতে আছে কে নেই এটা নবনী চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারে। কেউ যখন বাড়িতে থাকে তখন তার শরীরের জীবন্ত গন্ধ বাড়িতে ভাসতে থাকে। সে চলে গেলে গন্ধটা চলে যায়— ছোটবেলায় এই পরীক্ষা সে অনেকবার দিয়ে অনেক লোকজনকে চমৎকৃত করেছে। এখনো এই পরীক্ষা দিলে ভালো নম্বর পাবে।

নবনী উঠে বসল। এম্নিতেই ঘুম ভাঙার পর তার মন প্রফুল্ল ছিল— উঠে বসার পর মন প্রফুল্লতম হয়ে গেল। খাটের মাথার পাশে রাখা টেবিলে ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের পাশে টি ব্যাগ, চিনি, দুধ। কাজটা আনিস করে গেছে। ফ্লাস্কে গরম পানি যে আছে এটা নিশ্চিত। নবনী টেবিলের দিকে হাত বাড়াল। ফ্লাস্কের পাশে

খাম। আনিস চিঠি লিখে গেছে। আনিসের হাতের লেখা ডাক্তারদের হাতের লেখার মতো জড়ানো না, স্পষ্ট সুন্দর অক্ষর। নবনী খাম খুলে চিঠি বের করল।

নবনী,

খুব আরাম করে ঘুমাচ্ছ বলে ঘুম ভাঙালাম না। সকাল আটটায় আমাকে ক্লিনিকে যেতে হয়। ভেবেছিলাম আজ ছুটি নিয়ে তোমার ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করব। সম্ভব হলো না। ফ্লাস্ক ভর্তি গরম পানি রেখে গেলাম। আরো কিছু যদি লাগে— সুজাত মিয়াকে বলবে। সে ব্যবস্থা করবে। সে কথা বলে না, কিন্তু কাজে খুব দক্ষ। নাশতা খেয়ে নিও। আমার ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে। দুপুরে কী খেতে চাও সুজাত মিয়াকে বলবে। তোমার যা খেতে ইচ্ছে করে বললেই সুজাত রেঁধে দেবে। ও সব রান্না জানে।

আনিস

নবনী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকল— সুজাত মিয়া।

সুজাত দরজা ধরে দাঁড়াল। তার চোখ মেঝেতে। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সে মেঝেতে অদৃশ্য নকশা করছে। দৃষ্টি সেই নকশায় নিবন্ধ। সুজাত মিয়া যে শুধু কথাই কম বলে তা-না, চোখের দিকেও তাকায় না।

তোমার ভাইজান চিঠিতে লিখেছে আমি দুপুরে যা খেতে চাই তাই রেঁধে খাওয়াবে। পারবে?

সুজাত চোখের দিকে না তাকিয়েই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। নবনী গম্ভীর গলায় বলল, দুপুরে আমি পিজা খেতে চাই। পিজা বানাবে, ঠিক আছে?

সুজাত এবার চোখের দিকে তাকাল। এবং চট করে চোখ নামিয়ে নিল না, তাকিয়েই রইল। নবনী বলল— আমি এ বাড়িতে আসার পর থেকে লক্ষ করেছি তুমি কারোর চোখের দিকে তাকাও না। ক্রমাগত মেঝের দিকে তাকিয়ে থাক বলে তোমার ঘাড়ও বকের মতো বেঁকে গেছে। তুমি যাতে আমার চোখের দিকে তাকাও এজন্যেই পিজা খেতে চেয়েছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম পিজা খেতে চাই শুনলেই তুমি চমকে আমার চোখের দিকে তাকাবে। বুঝতে পারছ কি বলছি?

নবনী হাসিমুখে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। সুজাত মিয়া উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। নবনী বলল, এখন তোমাকে চা বানানো শেখাব। মন দিয়ে শিখবে। এরপর থেকে যেভাবে শেখালাম ঠিক সেইভাবে চা বানিয়ে দেবে। পারবে না?

সুজাত হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। নবনী বলল, চা বানানো শেখাবার পর আমি তোমাকে নিয়ে গ্রাম দেখতে বের হব। তোমাদের এখানে শ্মশান ঘাট আছে। তোমার ভাইজানের চিঠি পড়ে জেনেছি সেখানে শ্মশান বন্ধুদের একটা বসার ঘর আছে যার মেঝে শ্বেত পাথরে বাঁধানো— আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

জ্বি, আইচ্ছা।

এইতো কথা বলেছ! এখন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলবে— এসো এখন চা বানানো শেখাই— ওয়ার্কশপ অন টি মেকিং।

সুজত ফিস ফিস করে বলল, চা বানাইতে জানি।

নবনী কড়া গলায় বলল, বাজে কথা বলবে না— চা বানানো রন্ধনশিল্পের অতি কঠিন অংশ। খুব কম মানুষই এটা জানে। আমি কী করছি মন দিয়ে দেখ। প্রথমে কাপে দু'টা টি ব্যাগ নিলাম। এক চামচ গরম পানি ঢেলে দিলাম টি ব্যাগে। ব্যাগের ভেতরের শুকনা চা-পাতা এই পানিতে নরম হতে থাকবে। এই ফাঁকে চায়ের কাপ, চামচ ধুয়ে ফেলতে হবে গরম পানিতে... গরম পানিতে চায়ের চামচ ধোয়া অতি জরুরি। এতে চামচটা গরম হয়। তা না করলে ঠাণ্ডা চামচ চা থেকে অনেকটা তাপ নিয়ে নেবে। চা হয়ে যাবে ঠাণ্ডা।

সুজাত কাছে এগিয়ে এসেছে। খুবই আগ্রহ নিয়ে চা বানানো দেখছে। সে নবনীর চোখের দিকে কোনো রকম সঙ্কোচ ছাড়াই তাকাচ্ছে।

নবনী বলল, তোমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন গিয়েছে না?

সুজাত মাথা নাড়ল। নবনী বলল, মাথা নাড়ানাড়ি করবে না, মুখে কথা বল। গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন গিয়েছে?

দূর আছে। জংলা পার হইয়া যাইতে হয়।

তোমাদের এদিকে জঙ্গল আছে না-কি?

হুঁ।

কত দূর?

মেলা দূর।

হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাবে?

ফিরতে দিরং হইব। দুপুর পার হইব।

হোক দুপুর পার— চল রেললাইন দেখতে যাব। তোমার ভাইজান দুপুরে ভাত খেতে এসে দেখবে— ঘর তালাবন্ধ, কেউ নেই। সে আমাদের কোথাও

খুঁজে পাবে না। মজা ভালোই হবে। রেললাইন দেখার পর যদি দেখি হাতে সময় আছে তাহলে মন্দির দেখতে যাব।

নবনী মিটিমিটি হাসছে। সুজাত মিয়ার মনে হলো— ভাইজানের স্ত্রী মানুষটা অন্য রকম। ভাইজান ভালো, তার স্ত্রীও ভালো। দুইজন দুই রকম ভালো। একটা ব্যাপার শুধু মিলছে না। ডাক্তার সাবের পরিবার অতিরিক্ত সুন্দর। যারা অতিরিক্ত সুন্দর তারা ভালো হয় না। তাদের মধ্যে বড় কোনো দোষ থাকে। এটা পরীক্ষিত।

নবনীর মাথায় বাহারী লাল রঙের ছাতা। সুজাত মিয়ার কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগ ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম। নবনী এগুচ্ছে দ্রুত পায়ে। ঝাঁঝাঁ রোদ। কিন্তু তার হাঁটতে ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে গরম বাতাসের ঝাপ্টা চোখে মুখে লাগছে। শরীর চিড়বিড় করে উঠছে। এই চিড়বিড়ানিও ভালো লাগছে। গ্রামের মানুষজন কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। তাদের কৌতূহলী চোখের দিকে তাকাতেও মজা লাগছে। তারা কী ভাবছে জানতে পারলে ভালো হতো। এটা সম্ভব না। সুজাত মিয়া এখন বেশ সহজভাবেই নবনীর সঙ্গে গল্প করছে। তার গল্প বলার ভঙ্গি খুবই সংক্ষিপ্ত। গল্প শুরু করে সে চুপ করে যায়। বাকি অংশ প্রশ্ন করে করে বের করতে হয়। যেমন সুজাত মিয়া বলল— মেয়ে আসছে। হইলদা বোরকা।

নবনী বলল, কোন মেয়ে এসেছে বোরকা পরে ?

ইমাম সাবের।

যিনি মারা গিয়েছেন সেই ইমাম সাহেব ?

হুঁ। সকিনা।

সকিনা কি মেয়ের নাম ?

হুঁ।

কবে এসেছে ?

আইজ সকালে। খুব কানতেছিল।

কাঁদারই তো কথা। বাবা মারা গেছে। বাবার কবর দেখতে এসেছে। কাঁদবে না তো কী করবে ? খিলখিল করে হাসবে ?

দুই হাত দিয়া তেতুলগাছ ধইরা কানতেছিল। যে তেতুলগাছে তার বাবা ফাঁসি দিয়েছিল সেই তেতুলগাছ!

আহারে বেচারি।

তেতুলগাছ কাটাইয়া ফেলব। চেয়ারম্যান সাব হুকুম দিছে।

তেতুলগাছ কাটাবে কেন ?

তেতুল গাছে দোষ লাগছে। মানুষ যে গাছে ফাঁস নেয় হেই গাছে দোষ লাগে।

নবনী সুজাত মিয়ার দিকে তাকাল। গল্প শেষ হয়েছে না-কি আরো কিছু বাকি আছে সেটা জানার চেষ্টা। সুজাত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তেতুল গাছটার তেতুল ছিল খুবই মিষ্টি।

নবনী ধমক দিয়ে বলল, বাজে কথা বলবে না সুজাত মিয়া। তেতুল কখনো মিষ্টি হয় না। তেতুল একটা টক ফল।

আরবের তেতুল মিষ্টি হয়।

এটা তো আরব না, বাংলাদেশ। তাছাড়া ঐ তেতুল গাছের তেতুল আমি খেয়েছি। ভয়ঙ্কর টক। আমার সঙ্গে কখনো বানিয়ে কথা বলবে না। আমি নিজে কখনো বানিয়ে কথা বলি না। অন্যরা বললে রাগ করি। বুঝতে পারছ ?

জ্বে।

সুজাত মিয়া তোমার ক্ষিধে লেগেছে ?

না।

ক্ষিধে লাগলে বলবে। ব্যাগে বিসকিট আছে। আপেল আছে। রেল লাইন আর কতদূর ?

দূর নাই।

অনেকক্ষণ থেকেই তো বলছ দূর নাই। তারপরেও তো দেখা পাচ্ছি না।

সুজাত মিয়া দাঁত বের করে হাসল। কারণ অনেকক্ষণ থেকে সে যদিও দূর নেই বলছিল— এখন সত্যিই আর দূর নেই— বাঁকটা পার হলেই রেল সড়ক।

নবনী রেল সড়কে উঠে এসেছে। সে খুবই বিস্মিত বোধ করছে। অবিকল এ রকম রেললাইন সে স্বপ্ন দেখেছে। কোথাও দৃষ্টি আটকাচ্ছে না। যতদূর চোখ যাচ্ছে ফাঁকা মাঠ। রেললাইনের দু'পাশে কাশবন। বাতাসে কাশফুল কাঁপছে। ঢেউয়ের মতো হচ্ছে। স্বপ্নের কাশফুলগুলো এভাবেই কাঁপছিল।

রেললাইনের স্লীপারে পা রেখে রেখে নবনী এগুচ্ছে। তার শরীর কেমন ঝিম

ঝিম করছে। স্বপ্নে সে এভাবেই হাঁটছিল। স্বপ্নে সে ছিল একা। এখানে তার পাশে আছে সুজাত মিয়া। পা ছোট বড় হলেও সুজাত দ্রুত হাঁটতে পারে।

নবনী বলল— আশেপাশে কোনো ব্রীজ আছে ? নদীর ওপর পুল ?

সুজাত মিয়া বলল— আছে।

কোথায় ? সামনে না পেছনে ?

সামনে। তালবন্দির পুল। যাইবেন ?

নবনীর খুবই যেতে ইচ্ছা করছে। ব্রীজটাও স্বপ্নের ব্রীজের মতো কি-না, দেখা দরকার। কিন্তু আজ না। অন্য আরেক দিন যাবে। একা একা যাবে। হয়তো কালই যাবে।

সুজাত মিয়া।

জ্বি।

যেভাবে শিখিয়েছি ঠিক সেভাবে চা বানাও তো। রেললাইনের ওপর পা ছড়িয়ে বসে চা খাব।

ট্রেইন আসব। ট্রেইন আসনের সময় হইছে। দুপুরের ট্রেইন।

আসুক না ট্রেইন। ট্রেইন ট্রেইনের মতো আসবে। আমরা আমাদের মতো চা খাব।

নবনী ট্রেনের লাইনের ওপর বসেছে। কী মনে করে যেন মাথার ওপর ধরে রাখা ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলল। বাতাস লেগে সেই ছাতা ভাসতে ভাসতে কাশফুলের দিকে যাচ্ছে।

সুজাত মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে বেশ চিন্তিত বোধ করছে। জিনের আছর হয় নি তো ? মেয়ে রূপবতী হলে জিনের নজর হবেই। সেই মেয়ে যদি ভর দুপুরে খোলা চুলে জঙলার ভেতর দিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই।

আনিসের ক্লিনিকে আজ রোগীর খুব ভিড়। এর মধ্যে একজন এসেছে সাপেকাটা রোগী। এই সময় সাপেকাটা রোগী আসে না। শীত আসতে শুরু করেছে, সাপদের এখন দীর্ঘ দিনের জন্যে গর্তে ঢোকার প্রস্তুতি নেবার সময়। মানুষের গায়ে ছোবল দেওয়ার চেয়েও তারা ব্যস্ত থাকে ঘুমোবার আয়োজনে।

সাপেকাটা রোগীকে ঘিরে বেশ ভিড়। রোগীর বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। অত বলশালী ব্যক্তি। সে ঝিম মেরে গেছে। রোগীর ছেলেমেয়ে এবং দুই স্ত্রী চলে

এসেছে। দু'জন স্ত্রীই পাল্লা দিয়ে কাঁদছে। আনিস রোগীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আগে সাপেকাটা রোগীকে কেউ ক্লিনিকে আনত না। ওঝা ডাকিয়ে ঝাড় ফুক করত। আজকাল ক্লিনিকে আনছে। আনিস এন্টি ভেনম ইনজেকশন কিছু আনিয়ে রেখেছে। ইনজেকশনগুলো দামি। ঠাণ্ডায় রাখতে হয়। ক্লিনিকে ফ্রিজ নেই। গরমে ইনজেকশনগুলোর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া একেক ধরনের সাপের জন্যে একেক রকম এন্টি ভেনম। কোন সাপে কামড়েছে তা জানা দরকার। আনিসের ধারণা গ্রামের মানুষরা সাপের সঙ্গে বাস করলেও সাপ চেনে না। সাপে কাটা রোগী, যে নিজের চোখে সাপকে ছোবল দিতে দেখেছে সেও সাপটা কী রকম বলতে পারে না। কী সাপ ? প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর— কাল সাপ।

আনিসকে দেখে রোগী হাউমাউ করে উঠল— ডাক্তার সাব আমারে বাঁচান। কাল সাপ দংশন করছে। রোগীর কান্না শুনে তার দুই স্ত্রী আরো উঁচু গলায় কান্না শুরু করল। এই দু'জনের মধ্যে পাল্লা-পাল্লি ব্যাপার আছে। দু'জনই চেষ্টা করছে কে কার চেয়ে বেশি শব্দ করে কাঁদতে পারে। রোগী ওদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল— চুপ। দু'জনই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

কোথায় কামড় দিয়েছে ?

বুড়া আঙ্গুলের চিপাত।

সাপটা দেখেছেন ?

আবছা আবছা দেখছি— কাল সর্প।

দুই আঙ্গুলের ফাঁকে গভীর ক্ষত। সাপ দাঁত ফুটিয়ে এমন গভীর ক্ষত কখনোই করবে না। পুরা পা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। এটা হয়েছে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধার জন্যে। মাংস কেটে দড়ি ডেবে আছে।

পাও জ্বইল্যা যাইতেছে ডাকতার সাব।

কতক্ষণ আগে কামড়েছে ?

সইন্ধ্যা রাইতে ছোবল দিছে। পিসাব করতে জঙ্গলাতে গেছিলাম তখন ঘটনা ঘটছে। গত বচ্ছরও এই জঙ্গলাত সাপের ছোবলে মানুষ মরছে। এই বছর মরব আমি।

পায়ে বাঁধন কখন দিয়েছেন ?

রাইতেই বান দিছি। খবর পাইয়া আমার বড় বউ-এর বাপের বাড়ি থাইক্যা ছোট শ্যালক আসছে। হে শক্ত বান দিছে।

আনিস বলল, আপনাকে সাপে কামড়ায় নি। কাঁটার খোচা লেগেছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিলেই জ্বলুনি কমবে।

আমি নিজের চউক্ষে সাপ দেখছি ডাকতার সাব।

আপনার হাতে টর্চ হারিকেন এইসব কিছু ছিল ?

জ্বি না।

তাহলে সাপটা দেখবেন কীভাবে ? জঙ্গলে আলো কোথায় ? কৃষ্ণপক্ষের রাত।

রোগী চুপ করে গেল। আনিস তার পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল— গরম চা এক কাপ খান। খেয়ে বাড়ি চলে যান।

রোগী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। রোগীকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা খানিকটা হতাশ হলো। সাপে কাটা রোগী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসার মধ্যে কোনো নাটকিয়তা নেই। এই গল্প কাউকে করলে সে মজা পাবে না। সাপে কাটা রোগী মারা গেছে, কলার ভেলায় তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে— এই গল্প মজার। এই গল্প করতেও আনন্দ, শুনতেও আনন্দ।

রোগী বিড়ি ধরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে টানছে। এক স্ত্রী পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করছে। অন্য স্ত্রী স্বামীর সেবা করার কোনো কিছু না পেয়ে মন খারাপ করেছে। রোগী আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাক্তার সাব আমি চইল্যা যাইতেছি। আমার নামটা একটু ইয়াদ রাইখেন, আমার নাম হেকিম আলি। ঝিলকান্দার হেকিম আলি। আফনের যে-কোনো প্রয়োজনে আমি জান দিয়া দিব। আফনে আমারে জীবন দিয়েছেন এই জীবন আমি আফনেরে দিয়া দিলাম। ঝিলকান্দার হেকিম আলি দেনা রাখে না।

আনিস বলল, আমি জীবন দিব কী ? আপনাকে তো সাপেই কামড়ায় নি।

হেকিম আলি বিড়িতে লম্বাটান দিয়ে নিচু গলায় বলল— আমারে যে সাপে কাটছে এইটা আমি জানি, আপনে জানেন না। সাপের বিষ ক্যামনে আপনে পানি বানাইছেন সেইটা আফনে জানেন। আমি জানি না। আমার জানার দরকারও নাই। তয় ডাকতার সাব একটা কথা আপনেরে বইল্যা যাইতেছি, হেকিম আলি তার জেবন আপনের হাতে দিয়া গেল। নামটা ইয়াদ রাখবেন— ঝিলকান্দার হেকিম।

আনিস বিরক্ত বোধ করছে। অঞ্চলের লোকজন তাকে নিয়ে গল্প গাথা বানানো শুরু করেছে। তার মধ্যে রহস্যময়তা আরোপ করার চেষ্টা করছে।

গ্রামের মানুষ রহস্যমানব তৈরি করতে পছন্দ করে। আনিস জানে সে যে মাঝে মাঝে শ্মশানঘাটায় বসে থাকে তা নিয়েও গল্প তৈরি হয়েছে। এইসব গল্পের ফল বেশির ভাগ সময়ই শুভ হয় না।

আজিজ মিয়া সকাল থেকেই আনিসের ক্লিনিকে বসে আছে। ভূতের ভয়ে রাতে তার ঘুম হয় না। চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় ইমাম সাহেব তার আশেপাশে আছেন। আজিজ মিয়া ডাক্তারের কাছে এসেছে ঘুমের ওষুধ নিতে। সেই ওষুধ তাকে আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে যাচ্ছে না। আনিসের ধারণা মানুষটা তাকে গোপন কিছু কথা বলতে চায়। ক্লিনিক ফাঁকা হবার পর আনিস বলল, আজিজ সাহেব আপনি কি আরো কিছু বলবেন?

আজিজ মিয়া অপ্রস্তুত গলায় বলল, না। কোনো কাজ নাই, এইজন্যেই আপনার সামনে বসে আছি। আপনে রোগী দেখেন— এইটা আমার দেখতে ভালো লাগে।

আনিস বলল, আজকের মতো রোগী দেখা শেষ। আমি এখন উঠব।

আমিও উঠব ডাক্তার সাব। চলেন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত আগায়ে দেই।

আনিস উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, আবার বসে পড়ল। শান্ত গলায় বলল, আমি নিশ্চিত যে আপনি আমাকে কিছু বলতে চান। বলুন শুনি।

আজিজ মিয়া বিব্রত গলায় বলল, মনটা অত্যাধিক খারাপ— এইটা বলতে চাই আর কিছু না।

মন খারাপ কেন?

জহির খাঁ সাব আমারে দেখতে পারেন না। আমি কিছুই করি নাই, তারপরেও আমারে দেখতে পারেন না। এই জন্যে মনটা খারাপ।

আপনাকে দেখতে পারেন না কীভাবে বুঝলেন?

এইটা না বুঝার কোনো কারণ নাই। শখের জন্যে আড়ং-এর একটা ষাঁড় কিনছিলাম, উনার ধারণা হয়েছে আমি পাল্লা পাল্লি খেলায় নামছি। মনটা অত্যাধিক খারাপ ডাক্তার সাব। রাইতে যে আমার ঘুম হয় না এইটাও একটা কারণ। খুবই মন কষ্টে আছি ডাক্তার সাব। কখন কী হয়!

কখন কী হয় মানে কী?

মানে কিছু না, এম্নেই বললাম। আমার সামান্য টেকা পয়সা হইছে এইটা সত্য। তয় উনার সাথে পাল্লা দিব এইটা কেমন কথা?

আনিস বলল, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মন খারাপ করে থাকবেন না। জহির

সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ আছে— সম্পর্ক ভালো হবে।

আজিজ সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল— সম্পর্ক ভালো হওনের কোনো আশা নাই। এমন বিপদে পড়েছি। এখন একলা চলাফেরা করি না। লোকে ভাবতেছে ভূতের ভয়ে একলা চলাফেরা বন্ধ করছি। ভূতের ভয়ে বাজারে লোকজনের মধ্যে থাকি। আসলে ঘটনা অন্য। কাউকে না বইল্যা পারতেছিলাম না বইল্যা আফনেরে বললাম। গ্রামের পলিটিক্স— বড়ই কঠিন পলিটিক্স। আপনে শহরের ছেলে আপনে বুঝবেন না। কোনদিন শুনবেন আমার মরা লাশ পুসকুনিতে ভাসতেছে! গ্রামে রটনা হইব ভূতে আমারে পুসকুনিতে ফেইল্যা মারছে।

আনিস বাসায় ফিরল দুপুর একটায়। বাসা তালাবন্ধ। নবনী নেই, সুজাত মিয়াও নেই। বাড়ির বাইরের উঠানে আনিসের চুরি যাওয়া সাইকেল। কেউ একজন সাইকেলটা রেখে গেছে। আনিসের ভ্রূ কুঁচকে গেল। চুরি যাওয়া সাইকেল ফেরত পাওয়া আনন্দের ঘটনা। সমস্যা হলো— এখন এই সাইকেল নিয়ে নানান গল্প শুরু হবে। ডাক্তারকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে টেনে রহস্যমানবের স্তরে আনার প্রক্রিয়ায় সাইকেল ফেরত পাওয়ার ঘটনাটাও কাজ করবে।

জহির উদ্দিন খাঁ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। গরম পানি আনা হয়েছে। জলচৌকিতে বসে তিনি গোসল সারবেন। গোসলের আগে তাঁকে কিছুক্ষণ দলাই মলাই করা হবে। এতে তার ক্ষুধা বৃদ্ধি হবে। দুপুরের খাবারটা আরাম করে খাবেন। দুপুরে খাবারের পর দুই ঘণ্টা দিবানিদ্রা। তার দীর্ঘদিনের রুটিন। রুটিনে ব্যতিক্রম করলেই শরীর জানান দেয়। গরম পানির বদলে একদিন যদি ঠাণ্ডা পানি গায়ে দেন— সঙ্গে সঙ্গে গা ম্যাজ ম্যাজ। বদ হজম।

রুটিনের ব্যতিক্রম তিনি সচরাচর করেন না। আজ মনে হয় করতেই হবে। তার সামনে বেঞ্চে একজন বোরকাওয়ালি বসে আছে। এই বোরকা কঠিন বোরকা। বোরকার পেছনের মুখ দেখা দূরে থাক, চোখও দেখা যাচ্ছে না। বোরকাওয়ালির পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জেনেও জহির উদ্দিন খাঁ বিস্মিত। মনে মনে বলেও ফেলেছেন— মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মতো থাকতে হয়। মেয়েমানুষ পুরুষ হবার চেষ্টা করলে সমূহ বিপদ। একমাত্র কেয়ামতের আগে আগে মেয়েমানুষকে পুরুষের ওপরে স্থান দেয়া হবে। তখন তাদের চোখের

ইশারায় সংসার চলবে। পুরুষ হবে ছাগলের মতো। তাদের একমাত্র কাজ হবে স্ত্রীর দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে ভ্যা ভ্যা করা। কিন্তু সেই কেয়ামতের তো এখনো দেরি আছে।

জহির উদ্দিন খাঁ বোরকাওয়ালির নাম আগে একবার শুনেছেন। তারপরেও মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বললেন— তোমার নাম যেন কী বললা ?

বোরকাওয়ালি শান্ত কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, আমার নাম সকিনা।

তুমি ইমাম ইয়াকুব মোল্লার মেয়ে ?

জ্বি।

তোমারই বিবাহের কথা চলতে ছিল ? পাত্র কলেজের শিক্ষক ?

জ্বি ।

বিবাহ হয়েছে ?

জ্বি, না। বিবাহ ভেঙে গেছে।

আফসোস! বিবাহ ভাঙল কেন ?

বোরকাওয়ালি সহজ কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল— পাত্রপক্ষ বাপজানের খবরটা পেয়েছিল। তাঁকে নেংটা করে হাঁটানো হয়েছে, তিনি ফাঁস নিয়ে মরেছেন। এইসব খবর শুনলে আত্মীয়তা হয় না।

জহির খাঁ গম্ভীর গলায় বললেন— তুমি খবর যা পেয়েছ তার মধ্যে কিছু ভুল আছে। তাঁকে নেংটা করে হাঁটানো হয় নাই। শাস্তি আমি দিয়েছি, আমি জানি। সে রকম শাস্তিই দেয়ার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত দেয়া হয় নাই। তার পরনের পায়জামা খোলা হয় নাই। তুমি নিজে যখন এসেছ খোঁজ-খবর নাও। রটনা বিশ্বাস করা ঠিক না।

বাবাকে এই শাস্তি কেন দেয়া হলো এটা নিয়েও আমি খোঁজ-খবর করব।

কর। অনুসন্ধান করে দেখ। কন্যা হিসাবে এটা তোমার কর্তব্য।

আমি একটা মামলাও করতে চাই।

জহির খাঁ অবাক হয়ে বললেন, কী! মামলা ?

আমার বাবাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ভয়ঙ্কর লজ্জা দেয়া হয়েছে। বাবা আত্মঘাতী হয়েছেন। যারা এই কাজটা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা।

জহির খাঁ খুবই মজা পাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, কর, মামলা কর। থানা এখান থেকে দূরে আছে। প্রথমে নান্দাইল রোড যাও। সেখানে রিকশা পাবে।

মামলা ছাড়া আরো কিছু করার ইচ্ছা আছে?

জ্বি।

বল। সব এক সঙ্গে শুনি।

এখানে বাবার কবর হয়েছে। তার লাশ তুলে আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।

এটা করতে পারলে ভালোই হয়। কাঠের বাক্সে করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব না। মুনশি মৌলবিরা কী বলে আগে জানতে হবে। তাঁরা যদি বলেন লাশ নেয়া যাবে তাহলে নিয়া যাবে।

মুনশি মৌলবির কথা দিয়া কী হবে? মুনশি মৌলবিরা তো আমার বাবার জানাজাও করে নাই।

কাজটা যে তাঁরা ইচ্ছা করে করেছেন তা তো না। তাঁরা কাজ করেছেন হাদিস কোরান দেখে। যাই হোক, তুমি খাওয়া-দাওয়া করেছ?

না।

পরিশ্রান্ত হয়ে আসছ। বিশ্রাম কর। গোসল কর। তারপর খাওয়া-দাওয়া কর। তোমার থাকার জন্য একটা ঘর দিতে বলে দিব। কোনো অসুবিধা নাই। তোমার পিতা যখন প্রথম এখানে এসেছিলেন তখন প্রায় দুই বছর আমার বাড়িতেই ছিলেন। পরে মসজিদের কাছে তারে ঘর ওঠায়ে দেয়া হয়েছে।

আমি আপনার এখানে থাকব না।

কোথায় থাকতে চাও?

মসজিদের কাছে বাপজান যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে থাকব।

তোমার সাথে কে এসেছে?

কেউ আসে নাই।

মামলা মোকদ্দমা, লাশ কবর থেকে তোলা— সময়ের ব্যাপার। তোমাকে কয়েক দিন থাকতে হইতে পারে। একা থাকবা?

হ্যাঁ, একা থাকব।

ভয় পাইতে পার। নানান কথা এখন শোনা যায়। তোমার পিতাকে নিয়েই কথা। তুমি বোধহয় শুনেছ।

জ্বি আমি শুনেছি। এইজন্যেই আমি আরো বেশি করে থাকতে চাই।

ভূত-প্রেতের কথা বাদ দাও। ভূত-প্রেতের চেয়েও খারাপ জিনিস হলো

মানুষ। এই অঞ্চলে খারাপ মানুষের অভাব নাই। তুমি অল্প বয়েসী মেয়ে— একলা থাকবা!

আমি ভয় পাই না। আপনি আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে ?

আমি চাল-ডাল কিনে নেব। নিজেই রান্না করে খাব।

জহির খাঁ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— ভর দুপুরে আমার বাড়িতে আসছ। এই বেলা খাওয়া-দাওয়া কর। তারপর না হয় তুমি যেটা চাইতেছ সেটার ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি আপনার এখানে খাব না।

আমি গৃহস্থ মানুষ। দুপুরে গৃহস্থের বাড়িতে না খেলে অকল্যাণ হয়।

আপনি মনে কিছু নিবেন না। আমি আপনার এখানে খাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে।

বোরকাওয়ালি উঠে দাঁড়াল। জহির খাঁ তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা লম্বা। তার বাবা ছোটখাট মানুষ ছিলেন। মেয়ে বাবার মতো হয় নি। আবার ব্যবহারেও অমিল আছে। বাপ ছিল মেদামারা। মেয়ে শক্ত ধরনের। মেয়ের জিদ আছে। তবে মেয়েছেলের জিদ থাকা খারাপ। পুরুষের জিদ ভালো। কথায় আছে—

জিদের পুরুষ হয় বাদশাহ
জিদের মেয়ে হয় বেশ্যা।

জহির খাঁ ভ্রূ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকল। তিনি চিন্তিত বোধ করছেন না, তবে তার ক্ষিধা নষ্ট হয়ে গেছে।

তার গোসলের পানি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে— পানি আবার গরম করতে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তার খাস লোক— বদি মিয়া শরীরে তেল মাখাতে শুরু করেছে। রসুন দিয়ে জ্বাল দেয়া খাঁটি সরিষার তেল। এর সঙ্গে চায়ের চামচে দুই চামচ মধু মেশানো হয়েছে। এতে শরীরের বাহিরটা ঠাণ্ডা থাকে। গোসলের ঠিক পরে পরে আধা গ্লাস তোকমার সরবত খান। তোকমার সরবত শরীরের ভেতরটা ঠাণ্ডা রাখে। ভেতর বাহির দুই দিক ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

বদি মিয়া।

জ্বে।

মেয়েটার কথাবার্তা কেমন শুনলা ?

ভালো। তেজ আছে।

তেজ কয় প্রকার জান?

জ্বে না।

তেজ দুই প্রকারের। মুখের তেজ আর কাজের তেজ। যাদের মুখের তেজ থাকে তাদের কাজের তেজ থাকে না। যাদের কাজের তেজ থাকে তারার মুখে কোনো তেজ থাকে না।

খুবই সত্য কথা।

যে কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে হেই কুত্তায় কামড়ায় না।

অতি সত্য কথা।

জহির খাঁ অলস গলায় বললেন, দেখি এখন একটা শিল্লুক ধর। ভাঙাইতে পারি কি-না দেখি।

গা দলাই মলাইয়ের সময় জহির খাঁ খুব হালকা মেজাজে থাকেন। বদিকে তখন শ্লোক ধরতে বলেন। জহির খাঁ শ্লোক ভাঙিয়ে অত্যন্ত আনন্দ পান। শ্লোক ভাঙানোর ব্যাপারে তার দক্ষতা আছে। বদি তাঁকে আটকাতে পারে না।

বদি পিঠে তেল ডলতে ডলতে বলল—

মাইয়া লোকের হাতে নাচে
সাত শ' মুখ কার আছে?

জহির খাঁ চোখ বন্ধ করে বললেন— মেয়ে মানুষের হাতে নাচে? সাত শ' মুখ— চালুনি। চালুনি চালে মেয়েরা। চালুনির হাজার হাজার ফুটা। হয়েছে?

জ্বে হইছে। কন দেখি—

জলেতে জন্ম তার জলে ঘর বাড়ি
ফকির নহে ওঝা নহে মুখে আছে দাড়ি।

জহির খাঁ বললেন— চিংড়ি মাছ।

বদি আনন্দের সঙ্গে বলল— আপনেরে আটকানি কঠিন। আচ্ছা দেখি এইটা পারেন কি-না!

নৌকা নহে জলে চলে শূন্যতেও চলে
দিনেতে দেখি না তারে দেখি নিশাকালে
কহেন কবি কালিদাস।
এই শিল্লুক যে ভাঙতে পারে সে আমার দাস।

জহির খাঁর মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গেল। এই শ্লোকটা তিনি ভাঙ্গাতে পারছেন না। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন— এখন শরীরে পানি ঢালার ব্যবস্থা কর।

বদি পানি ঢালতে শুরু করল। জহির খাঁ বিরক্ত মুখে বসে রইলেন। বদিকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলবে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। মেজাজ খারাপ হচ্ছে। কবি কালিদাসের দাস হবার অপমানটা গায়ে বিঁধছে।

বদি।

জ্বে।

ডাক্তার সাব আর তার স্ত্রীরে আইজ রাইতে আমার সাথে খানা খাইতে বলবা।

জ্বে আচ্ছা।

নয়াপাড়া থাইক্যা ছগীররে খবর দিয়া আনবা। জাদু দেখাইব। শহরের মেয়ে গেরাইম্যা জাদু তো দেখে নাই। দেখলে খুশি হইব।

জ্বে আইচ্ছা।

তোমার শ্লোকটা কী আরেকবার বল দেখি—

নৌকা নহে জলে চলে শূন্যতেও চলে
দিনেতে দেখি না তারে দেখি নিশাকালে।

জহির খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন— জলেও চলে, শূন্যতেও চলে— বল কী?

বদি হাসিমুখে বলল, জিনিসটা হইল...

জিনিস কী তোমার বলার প্রয়োজন নাই। আমি বাইর করতেছি।

জহির খাঁ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

চৈত্র মাসের রোদে তালু ফাটে। কিন্তু এই রোদ তালু ভেদ করে মগজে ঢুকতে পারে না। আশ্বিন মাসের রোদ আবার অন্য রকম— এই রোদ তালু ভেদ করে মগজে ঢুকে যায়। মগজ ওলটপালট করে দেয়।

ছাতা থাকা সত্ত্বেও নবনী আশ্বিন মাসের রোদ পুরোটা মাথায় নিয়েছে। রেল সড়ক থেকে ফেরার পথে মাথায় ছাতা দেয় নি। গায়ে রোদ লাগাতে তার না-কি ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগা এখন উল্টো গীত গাইতে শুরু করেছে।

বাড়িতে ফিরেই নবনী বমি করল। আনিস অবাক হয়ে বলল, ব্যাপার কী?

নবনী বলল, ব্যাপার বুঝতে পারছ না? বমি করছি এই হলো ব্যাপার। তুমি ডাক্তার মানুষ। তুমি কি আমার আগে কাউকে বমি করতে দেখ নি?

জহির বলল, কী হয়েছে?

শরীর যেন কেমন করছে। তোমাকে অস্থির হতে হবে না। লম্বা গোসল দেব। শরীর সেরে যাবে।

আনিস বলল, দেখি তো জ্বর এসেছে কি-না।

জ্বর দেখতে হবে না। তুমি দয়া করে সামনে থেকে যাও— কটকটা রঙের কী পাঞ্জাবি পরেছ— চোখে লাগছে।

কোথায় গিয়েছিলে?

রেল সড়ক দেখতে গিয়েছিলাম।

বল কী? অনেক দূর তো! হেঁটে গিয়েছ?

নবনী বলল, না হেঁটে কেন যাব, হেলিকপ্টার চার্টার করে গিয়েছি। তোমার তদন্ত যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে সামনে থেকে যাও। তোমার শার্টের দিকে যতবার তাকাচ্ছি, ততবার শরীর ঝিমঝিম করে উঠছে।

আনিস বলল, তোমার সামনে থেকে যেতে চাচ্ছি না। শার্টটা বরং বদলে আসি।

নবনী ক্লান্ত গলায় বলল, যাও বদলে আস। হালকা রঙের কিছু পরবে। সবচে' ভালো হয় সাদা।

নবনী এক ঘন্টা সময় লাগিয়ে গোসল করল। গোসল শেষ করে বিছানায় পড়ে গেল। তার গায়ের তাপ এক শ' তিনের চেয়েও সামান্য বেশি। আনিস বলল, খুব খারাপ লাগছে?

নবনী বলল, খুব খারাপ না। মোটামুটি খারাপ লাগছে।

বমি ভাবটা কি গেছে না এখনো আছে?

এখনো আছে।

তাহলে কিছু খাবার দরকার নেই। শুয়ে থাক। ওষুধ দিচ্ছি, এক্ষনি জ্বর নেমে যাবে।

নবনী বলল, ওষুধ দিয়ে এই জ্বর নামাতে পারবে না। এই জ্বর খুব বাড়বে। সারা রাত ছটফট করব। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ব, তখন জ্বর থেমে যাবে।

কীভাবে বলছ ?

আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। ইএসপি পাওয়ার। সেই ক্ষমতা থেকে বলছি।

তোমার ক্ষমতার ব্যাপারটা মানলাম। তারপরেও ওষুধ দিচ্ছি, খাও।

নবনী তরল গলায় বলল, যে ওষুধে কাজ করবে না সেই ওষুধ খেয়ে লাভ কী ? ওষুধ খাব না।

ছেলেমানুষি করো না তো।

আমি ছেলেমানুষি করছি না। ওষুধ আমি খাব না।

আচ্ছা ঠিক আছে ওষুধ খেতে হবে না। দেখি জ্বরটা আরেকবার দেখি।

নবনী ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জ্বর আরো খানিকটা বেড়েছে। এখন আমার জ্বর এক শ' চার।

এটাও কি ইএসপি ক্ষমতা ব্যবহার করে বলছ ?

হ্যাঁ।

জ্বর দেখতে পারব না ?

না।

পাশে তো বসে থাকতে পারি। না-কি সেটাও পারব না ? কটকটে রঙের শার্টটা বদলে সাদা পাঞ্জাবি পরেছি। এখন নিশ্চয়ই চোখে লাগছে না।

নবনী বলল, খাটে না বসে চেয়ারটায় বোস। জ্বর যখন বেশি হয় তখন চোখে আপনাআপনি একটা জুম এফেক্ট তৈরি হয়। সব কিছু চোখের কাছাকাছি চলে আসে। তুমি যদি খাটে বস— আমার কাছে মনে হবে তুমি চোখের ওপর বসে আছ।

আনিস চেয়ারে বসল। সে চিন্তিত বোধ করছে। জ্বর যে বাড়ছে এটা বুঝা যাচ্ছে। রোগী ডিলেরিয়ামে চলে যাচ্ছে। তার লক্ষণ স্পষ্ট। চোখের তারা ডাইলেটেড হয়েছে। অর্থহীন কথাবার্তা বলা শুরু হয়েছে।

নবনী আনিসের দিকে ফিরল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি চাচ্ছি জ্বরটা আরেকটু বাড়ুক।

আনিস বলল, কেন ?

আমি খুব জরুরি কিছু কথা তোমাকে বলতে চাচ্ছি। ক্লাস বাদ দিয়ে তোমার এখানে এসেছি কথাগুলো বলার জন্যে। মুশকিল হচ্ছে কথাগুলো বলতে পারছি

না। জ্বরের ঘোর তৈরি না হলে বলা যাবে না।

চুপ করে শুয়ে থাক। এখন কিছু বলতে হবে না।

জ্বরের এই সুযোগটা আমার গ্রহণ করা উচিত। এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে আর কখনো হয়তো বলতে পারব না।

কথাগুলো কি খুবই জরুরি?

হ্যাঁ জরুরি। খুবই জরুরি।

যদি খুব জরুরি হয়, তাহলে জ্বর লাগবে না। তুমি এম্নিতেই কথাগুলো বলবে। হয়তো একটু বেশি সময় নেবে। তাছাড়া জরুরি কথা খুব গুছিয়ে বলতে হয়। মাথায় জ্বর নিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে না।

আমি কি এলোমেলোভাবে কথা বলছি?

না, তা বলছ না।

তাহলে কথাগুলো আমি এখনি বলব। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাব। ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখানে বরফ পাওয়া যায় না, তাই না?

সিদ্ধিরগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে বরফকল আছে। আমি সুজাত মিয়াকে বরফ আনতে পাঠিয়েছি।

কখন পাঠিয়েছ?

তুমি যখন গোসল করছিলে তখন।

থ্যাংক য়্যু। বরফ আসছে শুনেই ভালো লাগছে। তুমি মানুষটা খুবই গোছানো। তোমার মতো স্বামী পাওয়া যে-কোনো মেয়ের জন্যে ভাগ্যের ব্যাপার। হয়তো আমার জন্যেও।

হয়তো বলছ কেন? সন্দেহ আছে?

হ্যাঁ, সন্দেহ আছে। বাতি নিভিয়ে দাও চোখে আলো লাগছে।

আনিস বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কী বলতে চাচ্ছিলে বল।

নবনী ক্লান্ত গলায় বলল, আমি অন্ধকারে কথা বলতে পারি না। কথা বলতে হলে— আমার মুখ দেখতে হয়। কাজেই আজ বাদ থাক।

আনিস বলল, আচ্ছা বাদ থাক। সঙ্গে সঙ্গে নবনী খাটের ওপর উঠে বসে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলছি। তুমি শুনে খুবই মনে কষ্ট পাবে, তারপরেও বলছি— তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা ওয়ার্ক আউট করছে না। মানুষ হিসেবে তুমি খুব ভালো, মেয়ে হিসেবে আমিও ভালো। তারপরেও না।

আমাদের বিয়েটা ফেল করেছে।

আনিস সহজ গলায় বলল, এখনো তো সময় আছে।

নবনী বলল, সময় তো আছেই। জোড়াতালি দিয়ে আমরা হয়তো এগিয়ে যাব। আমি জোড়াতালি ব্যাপারটা পছন্দ করি না।

আনিস বলল, তোমার শরীর ভালো না। জ্বর অনেক বেড়েছে। জটিল একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করার মতো অবস্থা তোমার না। আমরা পরে আলাপ করি।

নবনী বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আমার কথা যা বলার বলে ফেলেছি। আমার আর কিছু বলার নেই।

জহির খাঁ খেতে বসেছেন। একটু দূরে বসেছে ছগীর। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ভালো। গ্রামের দাওয়াতে পোলাও কোরমা থাকেই— তার পরে আছে রুই মাছ ভাজা। এককেটা টুকরা প্লেটে ধরে না এত বড়! মাছের মাথাটা ছগীরকে দেওয়া হয়েছে। সে কিছুক্ষণ পর পর তৃপ্তি নিয়ে মাছের মাথাটার দিকে তাকাচ্ছে। জহির খাঁ বললেন, পাক কেমন হয়েছে?

ছগীরের মুখ ভর্তি মাছ। সে অনেক কষ্টে বলল, বেহেশতী খানা হইছে চেয়ারম্যান সাব। দাওয়াতী মেহমান এই খানা খাইতে পারল না, এটা একটা আফসোস।

আফসোস করার কিছু নাই। আইজ আসতে পারে নাই, আরেকদিন আসব। সুবিধা অসুবিধা সবেরই আছে।

শুনেছি ডাক্তার সাবের ইস্ত্রীরে জিনে ধরেছে। সারা দিন আউলা চুলে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে। সুযোগ বুইজ্যা ধরছে জিনে।

শোনা কথায় কান দিও না। কানের ওপরে বিশ্বাস নাই, কান নিমকহারাম।

অতি খাঁটি কথা বলেছেন চেয়ারম্যান সাব।

তরকারিতে লবণ কি একটু কম হয়েছে?

একদানা লবণ কম হয় নাই, আবার একদানা লবণ বেশিও হয় নাই। জবরদস্ত হইছে।

খাও, আরাম কইরা খাও। মাথাটা ভাইঙ্গা মুখে দেও।

ছগীর আগ্রহের সঙ্গে মাথা ভাঙ্গল।

আনন্দে তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে অতি সাধারণ একজন। রেলে রেলে ম্যাজিক দেখায়। দড়ি কাটার ম্যাজিক, পয়সার ম্যাজিক, তাসের ম্যাজিক। সস্তার জিনিস। তারপরেও চেয়ারম্যান সাহেবের মতো মানী লোকের কাছে তার ডাক পড়ে। এটা ভাগ্য ছাড়া আর কী? তাকে অবহেলাও করা হচ্ছে না। উঠানে কলাপাতায় খাবার দেওয়া হচ্ছে না। চিনামাটির বাসনেই সে খাচ্ছে। চলে যাবার সময় চেয়্যারম্যান সাহেব দশ টাকা বখশিশও তাকে দেবেন।

মতি নান্দাইল রোড থেকে অনেক রাতে ফিরছে। তার হাতে হারিকেন। হারিকেনের সবচে' বড় অসুবিধা হলো— দূরের কিছু দেখা যায় না। গ্রামে পথ চলার জন্যে হারিকেন কাজের কিছু না। অন্ধকারে পথ চলতে লাগে টর্চ। মতির টর্চের ভাগ্য খুব খারাপ। টর্চ কেনার সাতদিনের মাথায় সে হারাবেই।

ডাক্তার সাহেবের সাইকেল বেচা টাকায় টর্চ কিনতে গিয়েও সে কেনে নি। কী হবে কিনে! দু'দিন পরে তো হারিয়েই যাবে। এখন মনে হচ্ছে টর্চ না কেনাটা খুবই বোকামি হয়েছে। গ্রামে নানান উপদ্রব শুরু হয়েছে। চোর-ডাকাতের চেয়েও হাজার গুণে ভয়ঙ্কর কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় টর্চ ছাড়া গ্রামে আসাই ঠিক না। একটা টর্চ, একটা হারিকেন। টর্চ দরকার দূরের জিনিস দেখার জন্যে। হারিকেন দরকার জ্বলন্ত আগুনের জন্যে। নিশিরাতে মানুষের শরীর ধারণ করে যারা চলাফেরা করে, তারা একটা জিনিশই ভয় পায়। সেই জিনিশের নাম— আগুন।

জুম্মাঘরের কাছাকাছি এসে মতি বিড়ি ধরাল। জিন-ভূত বিড়ির আগুনকেও ভয় পায়। বাতাসের হঠাৎ ঝাপ্টায় হাতের হারিকেন নিভে যেতে পারে। বিড়ির আগুন নিভবে না। সবচে' ভালো ছিল আয়াতুল কুরসির তাবিজ। গলায় একটা তাবিজ পরা থাকলে দশ হাতের ভেতর জিন, ভূত, খারাপ বাতাস কিছুই আসতে পারে না। এই তাবিজের বড় সমস্যা হলো— তাবিজ গলায় নিয়ে নাপাক অবস্থায় থাকা যায় না। আজে বাজে জায়গায় যাওয়া যায় না।

মতি থমকে দাঁড়াল। ইমাম সাহেবের বাড়ির উঠানে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে! হারিকেনের আলো উঠানে পর্যন্ত যাচ্ছে না। তারপরেও মতি নিশ্চিত— একজন কেউ হাঁটাহাঁটি করছে। তার গায়ে কালো আচকান। মতির শরীর ঘেমে গেল। তার সমস্ত মন চাচ্ছে— হারিকেন ফেলে উল্টো দিকে দৌড় দিতে— কিন্তু হাত পা জমে গেছে। সে বুঝতেই পারল না, কখন তার হাত থেকে হারিকেন পড়ে গেছে। সে বিকৃত গলায় বলল, কে কে? উঠানে কে?

মতি অবাক হয়ে দেখল উঠানের মানুষটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আবারো ভাঙা গলায় বলল, কে কে ?

মানুষটা থমকে দাঁড়াল। স্পষ্ট গলায় বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমি জিন ভূত না। আমার নাম সকিনা। আমি ইমাম সাহেবের মেয়ে।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা হারিকেন নিভে যায় নি। দপদপ করে জ্বলছে। প্রচুর ধোঁয়া বের হচ্ছে। মতি হারিকেন তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে যে মেয়েটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে— এত রূপবতী মেয়ে সে তার জীবনে কখনো দেখে নি। বেহেশতের পরী এই মেয়ের কাছে কিছু না। বেহেশতের যে-কোনো হুরকে এই মেয়ে দাসী হিসাবে বিনা বেতনে তার কাছে রেখে দিতে পারে।



রাত একটা।

আজিজ মিয়া ঘুমুচ্ছিল বাজারের ঘরে। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভাঙল। দুঃস্বপ্নটা এতই স্পষ্ট যে মনে হচ্ছিল ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। সে দেখল তার বাড়িতে একটা কফিন এসেছে। কফিন সে আগে কখনো দেখে নি। কিন্তু স্বপ্নে দেখামাত্র সে কফিনটা চিনতে পারল। বুঝতে পারল এই বাক্স করে মৃত ছেলে এসেছে। অথচ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার নিয়ে কারো মনেই কোনো টেনশান নেই। আজিজ মিয়ার স্ত্রী হাফিজা যথারীতি জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছে। পানের পিক ফেলে কাকে যেন বলল, আমার মাথায় তেল দিয়ে দে। কে একজন তার মাথায় তেল দিতে বসল।

আজিজ মিয়া অবাক হয়ে দেখল সবাই তাদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। একজন আড়ং-এর ষাঁড়কে ভুষি দিচ্ছে। আরেকজন ষাঁড়ের গোসলের ব্যবস্থা করছে। হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেব চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছেন। স্কুলে চাঁদা দিতে হবে। হেডমাস্টার সাহেবকে বিসকিট দিয়ে চা দেয়া হয়েছে। তিনি চায়ে বিসকিট ডুবিয়ে খাচ্ছেন। অথচ উঠানে কফিনটা পড়ে আছে, কেউ কফিন খোলার কথা বলছে না।

আজিজ মিয়া নিজেই কফিন খুলতে এগিয়ে গেল। সেখানে দেখা গেল ইমাম সাহেবকে। স্বপ্নের মধ্যেই আজিজ মিয়া বুঝতে পারছে ইমাম সাহেব জীবিত না। তিনি তেতুল গাছে ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন। আজিজ মিয়াকে দেখে ইমাম সাহেব বললেন, আপনি করেন কী! কফিন খুলতেছেন কেন ? যে রকম আছে সে রকম থাকুক।

স্বপ্নের মধ্যেই আজিজ মিয়া রাগী গলায় বলল, আমার ছেলেকে আমি দেখব না ?

ইমাম সাহেব বললেন, না দেখবেন না। দেখলে কষ্ট পাবেন। আপনার ছেলে ফাঁস নিয়ে মরেছে। লাশ বিকৃত হয়ে গেছে। এই লাশ কাউকে দেখানোর

দরকার নাই। আসুন চুপিচুপি কবর দিয়ে ফেলি।

আজিজ মিয়া আর্তনাদ করে বলল, আমার ছেলের জানাজা হবে না ?

ইমাম সাহেব বললেন, না। আমার যেমন জানাজা হয় নাই, আপনার ছেলেরও হবে না। ফাঁসের মরার জানাজা হয় না। আসুন কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই গর্ত খুঁড়ে কফিন মাটির নিচে ঢুকিয়ে ফেলি।

তারপরই স্বপ্নের পট পরিবর্তন হলো। দেখা গেল মসজিদের পাশে তেতুল গাছের নিচে আজিজ মিয়া এবং ইমাম সাহেব কোদাল দিয়ে গর্ত করা শুরু করেছেন। শুধুই তারা দুইজন। আশেপাশে কেউ নেই। কোনো শব্দ নেই। শুধু কোদাল দিয়ে মাটি কাটার ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে।

আজিজ মিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পরও সে কোদালের ধুপ ধুপ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এই শব্দ যে তার হৃৎপিণ্ডের লাফানোর শব্দ তা বুঝতেও তার সময় লাগল। বুকের মধে শব্দ এত জোরে হচ্ছে মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি দূরে কোথাও কোদাল দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে— ধুপ ধুপ। ধুপ ধুপ।

চারদিক গাঢ় অন্ধকার। বাতাস শীতল। কোনো শব্দ নেই। ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না। শুধু দূরে কোদাল দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছে। আজিজ মিয়া হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। তার মনেই রইল না, সে এখন একা চলা ফেরা করে না। তার পা খালি। জুতা-স্যান্ডল কিছুই নেই। এখন তার একটাই চিন্তা— কত তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছানো যায়। সে দেখতে চায় তার বাড়ির উঠানে কোনো কফিন নেই।

অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়েছে। নক্ষত্রের আলোয় সব কিছুই আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। বাজার থেকে আজিজ মিয়ার বাড়িতে যাবার দু'টা রাস্তা আছে। একটা মসজিদের পাশ দিয়ে, অন্যটা ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক দিয়ে। দ্রুত আসা যাবে মসজিদের পাশ দিয়েই। আজিজ মিয়া সেই পথ ধরল। যদিও এই পথে এখন লোক চলাচল করে না। ভয় পায়। আজিজ মিয়া এখন যাবতীয় ভয়ের উর্ধ্বে। তাকে যে ভয় তাড়া করছে সে ভয়ের কাছে আর সব ভয় তুচ্ছ।

মসজিদ পার হয়েই আজিজ মিয়া থমকে দাড়াল। সড়কের ঠিক মাঝখানে কে যেন বসে আছে। ইমাম সাহেব না ? হ্যাঁ ইমামই তো— ইয়াকুব মোল্লা। সে তো মারা গেছে। তার কবর হয়েছে। সে এখানে রাস্তার মাঝখানে বসে আছে কেন ? আজিজ মিয়া চিৎকার করে বলল, কে কে ? কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বের হলো না। আজিজ মিয়া পেছনে ফিরল। পেছনেও একজন দাঁড়িয়ে

আছে। কে সে ? নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোয় কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। কিন্তু পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে সেও যে ইমাম সাহেব তা বুঝা যাচ্ছে। পেছনের ইমাম সাহেবের হাতে লম্বা ছুরি। কোরবানির সময় ইমাম সাহেব এরকম একটা ছুরি নিয়েই গরু জবাই করতে বের হতেন। আজিজ মিয়ার শরীর কাঁপছে। মনে হচ্ছে রাস্তার মাঝখানেই সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এটা করা যাবে না। তাকে পালাতে হবে। চিৎকার করে লাভ নেই, গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না। তাকে পালাতে হবে। কোন দিকে সে পালাবে ?

আজিজ মিয়া রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠে দাড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল। ইমাম সাহেবও তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে। একজন ইমাম না, দু'জন। একজনের হাতে ছুরি, আরেকজনের হাতে কিছু নেই। আজিজ মিয়া জানত ঘটনা শেষ পর্যন্ত এরকম ঘটবে। কারণ সে ইমাম সাহেবকে কানে ধরে স্কুলের মাঠে চক্কর দিয়েছে। এর শাস্তি ইমাম সাহেব তাকে দেবেনই।

বুকে হাঁপ ধরে গেছে। আজিজ মিয়া ঠিকমতো দৌড়াতে পারছে না। আজিজ মিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছন ফিরে দেখল ইমাম সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন। এখন ইমাম একজন না। তিনজন। শুধু একজনের হাতে ছুরি। অন্য দু'জনের হাত খালি। আজিজ মিয়া আবার দৌড়াতে শুরু করল। সে কোন দিকে যাচ্ছে নিজেও জানে না। একবার মনে হলো সে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে, একবার মনে হচ্ছে সে আসলে দৌড়াচ্ছে না, বাতাসে উড়ছে। সামনে এটা কী ? পুকুর না ? আজিজ মিয়া ঝাঁপ দিয়ে পুকুরে পড়ল। পুকুরের পানি বরফের মতো ঠাণ্ডা। হা- পা জমে যাচ্ছে। আজিজ মিয়া খুব ভালো সাঁতার জানে। কিন্তু সে সাঁতার দিতে পারছে না। পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। পুকুর পাড়ে তিন ইমাম দাঁড়িয়ে আছে। পুকুরের পানিতে তাদের ছায়া পড়েছে। ছায়া পড়ার কথা না। নক্ষত্রের আলোয় কোনো কিছুরই ছায়া পড়ে না। আজিজ মিয়া ক্ষীণ স্বরে ডাকল, ও বকুলের মা। ও বকুলের মা।

বকুল আজিজ মিয়ার ছেলের নাম। বকুলের মা জবাব দিল না। তখন আজিজ মিয়া ডাকতে শুরু করল তার মা'কে। ও মাইজী। ও মাইজী।

নবনীর জ্বর খুব বেড়েছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আনিস নবনীর মাথায় পানি ঢালছে। দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে তকিয়ে আছে সুজাত মিয়া। নবনীর এই অসুখের জন্য সে নিজেকে দায়ী করছে। সে তাকে

সঙ্গে করে রেল সড়কে গিয়েছে বলেই জিনের আসর হয়েছে। জিন তাড়াবার অনেক ভালো বুদ্ধি গ্রামদেশে আছে। জিনের ফকিরকে আনলেই সে ব্যবস্থা করবে। এই কথা ডাক্তার সাহেবকে বলার সাহস তার নেই। সে জানে ডাক্তার সাহেবও কঠিন লোক। পীর ফকিরের যে ক্ষমতা আছে, এই লোকেরও সেই ক্ষমতা আছে। সাপের ওঝা সাপের বিষ নামাতে পারে। ডাক্তার সাহেব ওঝা না হয়েও সাপের বিষ নামায়। তার সাইকেল চুরি করেও চোর সুবিধা করতে পারে নি। সাইকেল ফেরত দিয়ে যেতে হয়েছে। ডাক্তার সাহেব এক ধরনের সাধনাও করেন। শ্মশানঘাটে একা বসে থাকেন। তার জিন সাধনা থাকাও বিচিত্র না। জিনের চেয়েও বড় সাধনা আছে। পরী সাধনা। সেই সাধনাও থাকতে পারে। তারপরেও সুজাত মিয়ার ভয় লাগছে। কারণ বিরাটনগরের অবস্থা ভালো না। ইমাম সাহেব বড় ত্যক্ত করছে। কোরান হাদিস জানা লোক যখন অপঘাতে মরে তখন তাদের অনেক ক্ষমতা হয়। তার নমুনা দেখা যাচ্ছে— আজিজ মিয়াকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলল। তাকে যখন পানি থেকে তোলা হলো তখনও সামান্য জ্ঞান ছিল। কয়েকবার শুধু বলল, ইমাম সাব কই ? ইমাম সাব ? তারপরই সব শেষ। জীবন থাকতে থাকতে ডাক্তার সাবকে খবর দিয়ে নিলে ডাক্তার সাব তাকে বাঁচিয়ে ফেলতেন। খবরটা আসছে মৃত্যুর পরে। দুনিয়ার লোক ভিড় করেছে আজিজ মিয়ার বাড়িতে। সুজাতেরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। ভয়ের কারণে যায় নাই। ইমাম সাহেব আশেপাশেই আছে। কী দরকার।

আনিস সুজাতের দিকে তাকিয়ে বলল, জেগে থাকার দরকার নেই, তুমি শুয়ে পড়।

সুজাত দরজার আড়াল থেকে সরে গেল। কিন্তু শুয়ে পড়ল না। আজকের রাতটা ভালো না। ভয়ঙ্কর রাত। এই রাতে জেগে থাকা দরকার। আরো কত কী ঘটতে পারে। সুজাতের ধারণা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতেও কোনো একটা ঘটনা ঘটছে। কারণ এক ঘণ্টার ওপর হয়েছে বদি এসে বসে আছে। ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যেতে হবে চেয়ারম্যান সাহেব খবর পাঠিয়েছেন। সুজাতের ধারণা ডাক্তার সাহেব যাবেন না। চেয়ারম্যান সাহেবে পাইক বরকন্দাজ পাঠালেও যাবেন না। কারণ ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর অবস্থাও ভালো না। এমন একটা ভয়ঙ্কর রাতে স্ত্রীকে একা ফেলে ডাক্তার সাহেব যাবে না।

নবনী ক্ষীণ স্বরে বলল, একটু পানি খাওয়াও তো।

আনিস গ্লাসে করে পানি দিল। নবনী পানিতে একটা চুমুক দিয়ে গ্লাস

ফিরিয়ে দিল। পানি তিতা লাগছে। নবনী বলল, আমার জ্বর কি কিছু কমেছে?

আনিস বলল, না।

তা হলে কি সামান্য বেড়েছে?

হ্যাঁ একশ তিন ছিল। এখন হয়েছে একশ তিন পয়েন্ট পাঁচ। তবে মাথায় পানি ঢালছি। এনালজেসিক খাওয়ানো হয়েছে। জ্বর নেমে যাবে।

নবনী হালকা স্বরে বলল, তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা। আমি যখন বললাম জ্বর কি কমেছে তখনও অন্য যে-কোনো ডাক্তার হলে বলত হ্যাঁ সামান্য কমেছে। তুমি সত্যি কথাটা বললে। তবে আমার ধারণা মাঝে মাঝে মিথ্যা বলাটা অপরাধ না।

কথা না বলে ঘুমুবার চেষ্টা কর।

আমার কথা বলতে ভালো লাগছে।

তাহলে বল।

আমি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত।

এত চিন্তিত হবার কী আছে?

নবনী বলল, আমি ঘর পোড়া গরু তো এই জন্যেই চিন্তিত। আমি আবার বাবা-মা'কে দেখেছি।

আনিস বলল, তোমার কাছেই শুনেছি তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল।

বাইরে বাইরে ছিল। ভেতরে ছিল না। তেলে জলে কখনো মিশ খায় নি। তুমি তো জান না আমার মা একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা যান। ঘটনাটা আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি। প্রায় কেউই এই ঘটনা জানে না। জ্বরের ঘোরে তোমাকে বললাম।

তোমার মা যখন মারা যান তখন তোমার বয়স কত ছিল?

পনের বছর, আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি।

আমি যেমন দুঃস্বপ্ন দেখি আমার মাও সে রকম দুঃস্বপ্ন দেখতেন।

আনিস চুপ করে আছে। সে সামান্য চিন্তিত— জ্বর একেবারেই নামছে না। নবনী চাপা গলায় বলল, বাবা মাকে দেখে আমি কখনো বুঝতেই পারি নি তাদের সম্পর্কটা এতটা নষ্ট হয়েছে। কাজেই আমি ভয় পাই। আমি খুবই ভয় পাই।

আনিস বলল, কিছু কিছু মানুষ আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। স্বামী

এবং স্ত্রীর ভেতর খুব ভালো সম্পর্ক, তারপরেও দেখা যায় এদের একজন কেউ কাণ্ডটা করে ফেলেছে। এটা এক ধরনের অসুস্থতা।

নবনী ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যে অসুস্থতা আমার মায়ের মধ্যে আছে, সেই অসুখ তো আমার মধ্যেও থাকতে পারে। থাকতে পারে না ? মা'র জিন কি আমার মধ্যে নেই ? তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্র কী বলে ?

আনিস জবাব দিল না। নবনী বলল, তোমার এখানে এসে আমার সামান্য মন খারাপ হয়েছে। কেন জান ?

না, জানি না।

আমি দেখলাম আমি তোমাকে যে সব চিঠি লিখেছি তার সবই তুমি খুব যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে— অথচ তোমার চিঠিগুলো আমার কাছে নেই। চিঠি পড়া হয়ে গেছে, আমি ভুলে গেছি। এতে কি প্রমাণিত হয় তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কম ?

এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

হ্যাঁ প্রমাণিত হয়। আবার দেখ আমি জ্বরে ছটফট করছি— এই অবস্থায় আজিজ মিয়া নামে একজনের বাড়ি থেকে তোমাকে নিতে এল তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফেলে চলে গেলে। এখন আবার আরেকজন কে এসেছে, তোমাকে কোথায় যেন নিতে চায়। আমার অবস্থা যত খারাপই হোক তুমি কিন্তু ঐ লোকের সঙ্গে যাবে। যাবে না ?

হ্যাঁ যাব।

যে নিতে এসেছে তার নাম কী ?

তার নাম বদি।

বাহ্ সুন্দর নাম তো। বদ থেকে বদি। ভালো থেকে ভালি। আচ্ছা ভালি নামে কেউ কি তোমাদের এই বিরাটনগরে আছে ?

জানি না।

একটু খোঁজ নিয়ে দেখ তো।

আচ্ছা খোঁজ নেব। তুমি ঘুমুবার চেষ্টা কর।

আমাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি বদির সঙ্গে যেখানে যেতে চও— যেতে পার। এই যে তুমি আমাকে ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছ এতে কিন্তু আমার খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে বলব ?

বল।

নবনী আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমার এই কারণে ভালো লাগছে যে তোমারও আমার প্রতি আগ্রহ কম। যদি সে-রকম আগ্রহ সেরকম মমতা থাকত— আমাকে ফেলে যেতে পারতে না। আমি নিজেও খুবই অসুস্থ। মাথায় আর পানি দিও না। ভালো লাগছে না। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দাও।

আনিস মাথা মুছিয়ে দিল। নবনী বলল, এখন তুমি যেখানে যেতে চাও চলে যাও। কাল ভোরের ট্রেনে আমাকে তুলে দেবে। জ্বর কমুক বা না কমুক আমি চলে যাব।

আচ্ছা।

তুমি আমার সঙ্গে যাবে না। আমি যেমন একা এসেছি— একাই যাব।

আচ্ছা।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি আর দুঃস্বপ্ন দেখতে চাই না। বুঝতে পারছ আমি কী বলার চেষ্টা করছি?

তোমার শরীর ভালো না। তুমি কি বলছ নিজেও জান না।

আমি কী বলছি তা খুব ভালো করে জানি।

আনিস ক্লান্ত স্বরে বলল, তুমি যা চাইবে তাই হবে।

নবনী বলল, থ্যাংক য়্যু। এখন যাও, বদি বলে যে এসেছে তার সঙ্গে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকব।

নবনী চোখ বন্ধ করল।

পুরো গ্রাম জুড়েই উত্তেজনা।

প্রতিটি বাড়িতেই বাতি জ্বলছে। আজিজ মিয়ার বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। মানুষের উত্তেজনা পশুপাখিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কুকুর ডাকছে। মাঝে মাঝে কাক ডাকছে। কুকুর এবং কাক মানুষের খুব কাছাকাছি বাস করে। এরা মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চায়।

গ্রামের সব মানুষ জেগে থাকলেও রাস্তা ঘাট ফাঁকা। আনিস সাইকেল বের করেছে। অনেকদিন সাইকেলে চড়া হয় না। তার ইচ্ছা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়িতে প্রথমেই যাবে। ঘটনা কী জেনে ফেরার পথে ইমাম সাহেবের বাড়িতে

যাবে। সকিনা মেয়েটি সেখানে একা বাস করছে। সে নিশ্চয়ই খুব ভয় পাচ্ছে। মেয়েটাকে বলবে তার বাড়িতে চলে আসতে। নবনী কাল চলে যাবে। সেও চলে যাক নবনীর সঙ্গে। তার এখানে একা থাকা ঠিক না। আনিসের শ্মশানঘাটে যেতেও খুব ইচ্ছা করছে। নবনীর আসার পর থেকে শ্মশানঘাটে যাওয়া হয় নি। অন্ধকার রাতে শ্বেতপাথরের মেঝেতে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকা। আকাশের তারা দেখা।

আনিসের ধারণা নবনী খুব ভুল চিন্তা করে নি। তাদের দু'জনের সম্পর্ক জমাট বাঁধে নি। সম্পর্কের রসায়নে খুব সূক্ষ্ম কোনো সমস্যা হয়েছে— সম্পর্ক জমাট বাঁধতে পারছে না। সম্পর্ক যে জমাট বাঁধে নি তার সবচে বড় প্রমাণ শ্মশানঘাটে নবনীকে তার নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে নি। এই জায়গাটা যেন শুধুই তার একার। সেখানে অন্য কেউ যাবে না।

নবনীর সঙ্গে তার বিয়েটা প্রেমের বিয়ে এটা বলা যাবে না। দুজনের পরিচয় খুবই আকস্মিক। নীলক্ষেতে পুরনো বইয়ের দোকানে আনিস বই ঘাটছিল। এই দোকানগুলিতে হঠাৎ হঠাৎ কিছু ভালো বই পাওয়া যায়। Psychology of Dying Cancer Patients নামের অসাধারণ একটা বই মাত্র চল্লিশ টাকায় এখান থেকেই আনিস কিনেছিল। ধর্মগ্রন্থ মানুষ যেভাবে পাঠ করে, এই বই আনিস সেভাবেই পাঠ করে।

আনিস নিজের মনে বই ঘাঁটছে তখন একজন কে যেন আনিসের পাশে এসে বলল, আপা আপনাকে একটু ডাকে। আনিস তাকিয়ে দেখল— একটু দূরে গাড়ি পার্ক করা। গাড়িতে অতি রূপবতী এক তরুণী বসে আছে। আনিস তরুণীকে চিনতে পারল না। আনিস বলল, আপনার ভুল হয়েছে। আমাকে না, উনি হয়তো অন্য কাউকে ডাকছেন— ।

লোকটি বলল, আপনাকেই ডাকেন। আপনার নাম আনিস না ?

আনিস বলল, হ্যাঁ আমার নাম আনিস।

বই ঘাঁটা বন্ধ করে আনিস এগিয়ে গেল। তরুণী মেয়েটি বলল, আপনার নাম আনিস না ?

আনিস বলল, হ্যাঁ।

আপনারা ছোটবেলায় কখনো কুমিল্লায় ছিলেন ?

ছিলাম।

আপনার ছোটবোন মিনুর সঙ্গে আমি পড়তাম।

মিনু নামে আমার কোনো ছোটবোন নেই।

মিনু নানার বাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিল। আপনাদের নানার বাড়ি ময়মনসিংহে।

আনিস খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, কোনো এক জায়গায় আপনার ভুল হচ্ছে। আমার নাম আনিস ঠিক আছে। কুমিল্লায় ছোটবেলায় ছিলাম তাও ঠিক আছে। আমাদের নানার বাড়ি যে ময়মনসিংহ তাও ঠিক— কিন্তু আমি সেই মানুষ না।

আপনার বাবা কানাডায় থাকতেন। মিনুর মৃত্যুর পর তিনি সবাইকে নিয়ে কানাডা চলে যান।

আনিস হতাশ গলায় বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আমি বরং একটা কাজ করি— আমার বাবা-মা কলাবাগানে থাকেন। আমি একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে কথা বললেই আপনার কনফিউসন দূর হবে।

তরুণী শক্ত গলায় বলল, ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার সবই লিখে দিন। আমি আজই যাব। এখনি যাব। এক কাজ করুন— ঠিকানা লেখার দরকার নেই আমি অপেক্ষা করছি। আপনি বই ঘাঁটছিলেন বই ঘাঁটা শেষ করে গাড়িতে উঠুন। আপনাকে নিয়েই আমি যাব।

আনিস বলল, আপনার কি সন্দেহ আমি আপনাকে ভুল ঠিকানা দেব ?

এরকম সন্দেহ যে আমার হচ্ছে না, তা-না।

আনিসের বাড়িতে গিয়ে তরুণী মেয়েটির সন্দেহ দূর হয়েছিল। তারপরেও সে অনেকক্ষণ সে বাড়িতে রইল। খাটে পা তুলে নিতান্ত পরিচিতজনের মতো বসে গল্প করতে লাগল। আনিসের মা যখন বললেন, মা আজ দুপুরে তুমি আমাদের সঙ্গে খাও— নবনী তৎক্ষণাৎ বলল, আচ্ছা। এক পর্যায়ে আনিসের বাবা এসে ইশারায় তাকে ডেকে পাশের কামরায় নিয়ে গলা নিচু করে বললেন, মা তুমি ঐ মহিলাকে বল সে যেন এ রকম শব্দ করে না হাসে। আমার কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। জরুরি একটা কাজ করছি এর মধ্যে বাড়ি ঘর কাঁপিয়ে হেহেহে। মেয়েদের হাসির মধ্যে একটা সৌন্দর্য থাকবে, মাধুর্য থাকবে। তার কিছুই নেই। হাসি শুনলে মনে হবে কয়েকটা হায়না ঝগড়া করছে। এ ওকে কামড়াচ্ছে।

নবনী বলল, আপনাদের মধ্যে কি ঝগড়া হয়েছে ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা বন্ধ। আবার যে কথা বলা শুরু করব এটাও মনে হচ্ছে না। মা তুমি কি আরেকটা কাজ করতে পারবে, হায়নাটাকে বলবে যে আজ থেকে আমি তার খাবার মুখে দেব না। হোটেল থেকে খাবার এনে খাব। কথাটা বলতে পারবে? বলতে পারলে খুব ভালো হয়।

নবনী হাসতে হাসতে বলল, পারব।

দুপুরে খেতে বসে নবনী অবাক হয়ে দেখল আনিসের বাবা সত্যি সত্যি হোটেল থেকে বিরিয়ানী নিয়ে এসেছেন। একই টেবিলে বসে খুব আয়োজন করে খাচ্ছেন। নবনীর খুবই মজা লাগল।

আনিসের মা'র এই মেয়েটিকে এতই পছন্দ হলো যে দুপুরে খেতে বসেই তিনি ঠিক করলেন— যে করেই হোক এই মেয়েটির সঙ্গেই আনিসের বিয়ে দিতে হবে। তাঁর আগ্রহেই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়। নবনীর দিক থেকেও হয়তো আগ্রহ ছিল। আনিসের আগ্রহ অনাগ্রহ কিছুই ছিল না।

যে মেয়ে মনে মনে অন্য একজনকে অনুসন্ধান করছে তার প্রতি আগ্রহ তৈরি হবার কথাও না। নবনী হয়তো ভেবেছিল এই আনিস তার কল্পনার আনিসের কাছাকাছি যাবে। সেটা সম্ভব হয় নি। নবনীর কল্পনার মানুষটা কেমন আনিস তা জানে না। কল্পনার মানুষের চরিত্রে অভিনয় সে করতে পারে নি। ইচ্ছাও হয় নি।

জহির খাঁর বাড়ির উঠোন ভর্তি মানুষ। সব ক'টা ঘরে হারিকেন জ্বলছে। পল্লী বিদ্যুতের কানেকশন থাকলেও আজ ইলেকট্রিসিটি নেই। দু'টা হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার প্রায় দূরই করে দেয়া হয়েছে। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে মাঝলা ঘরের উঠোনে। আরেকটা মূল বসত বাড়ির বারান্দায়।

জহির খাঁ সাধারণত মাঝলা ঘরেই সময় কাটান। আজ তিনি শুয়ে আছেন নিজের ঘরের পালংকে। সেখানে বাইরের লোকজনের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কিন্তু আনিসকে সরাসরি সেখানেই নিয়ে যাওয়া হলো।

ঘরে বিশাল এক রেলিং দেয়া খাট। খাটে তিনটা বালিশ পেতে আধশোয়া হয়ে জহির খাঁ এলিয়ে পড়ে আছেন। তার গায়ে তসরের হলুদ রঙের চাদর। চাদরের নিচে একটু পরে পরেই তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন। খাটের রেলিং ধরে হেনা চিন্তিত এবং ভীত চোখে দাঁড়িয়ে আছে। জহির খাঁর চোখ লাল তবে তিনি নেশাগ্রস্ত না। ঘরে এলকোহলের গন্ধ নেই। কর্পূরের গন্ধ আছে।

আনিস বলল, আপনার কি শরীর খারাপ করেছে ?

জহির খাঁ বললেন, শরীর ভালো না খারাপ সেই আলাপ পরে হবে। তুমি ঐ চেয়ারটায় বস।

হেনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, উনার শরীর খুবই খারাপ।

জহির খাঁ ধমক দিয়ে বললেন, তোমারে কে কথা বলতে বলছে ? আমার শরীর ভালো না মন্দ সেইটা আমি বুঝব। ঘর থ্যাইকা যাও।

হেনা চোখ মুখ শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েই রইল। জহির খাঁ প্রচণ্ড ধমক দিলেন— কঠিন গলায় বললেন, যাও ঘর থাইক্যা। হেনা বের হয়ে গেল। জহির খাঁ বললেন, ডাক্তার এখন তুমি আমারে পরীক্ষা-টরীক্ষা যা করার কর।

আনিস কাছে গেল। গায়ে জ্বর নেই। বরং গায়ের তাপ স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কম। তবে নাড়ি খুব দ্রুত চলছে। প্রায় একশ'র কাছাকাছি। মাঝে মাঝে ড্রপবিট হচ্ছে।

জহির খাঁ বললেন, কি দেখলা ?

আনিস বলল, গায়ে জ্বর নেই তবে নাড়ি দ্রুত চলছে। আপনি কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব উত্তেজিত।

বিষয়টা কি তুমি অনুমান করতে পার ?

জ্বি না। আমার অনুমান শক্তি ভালো না।

জহির খাঁ বিছানায় উঠে বসলেন। লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমারে আমি অত্যধিক স্নেহ করি বলেই বলতেছি। নয়তো বলতাম না। ডাক্তার শোন, আমি সব সময় নানান উত্তেজনার মধ্যে থাকি। উত্তেজনায় থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এতে আমার শরীর খারাপ করে না। ঘটনা ভিন্ন। তুমি আমার ঘটনাটা আগে শোন— তারপরে চিকিৎসা কর। বুঝতে পারতেছি আমার চিকিৎসা দরকার। আমার শরীর অতিরিক্ত খারাপ। নিঃশ্বাস নিতে পারতেছিলাম না। তুমি বাড়ির কাছে আইসা সাইকেলের ঘণ্টা দিলা তারপর থাইক্যা নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি।

হেনা আবার এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। জহির খাঁ প্রচণ্ড ধমক দিলেন— আবার কেন আসছ ?

ধমকে হেনা কেঁপে উঠল, কিন্তু খাটের রেলিং ধরেই থাকল। আনিস বলল, আপনি এখন যান। উনার মেজাজ ঠিক হলে আসুন। চেয়ারম্যান সাহেবের হার্টের অবস্থা ভালো না। এই সময় তাঁকে আর উত্তেজিত করা ঠিক হবে না।

হেনা চলে গেল। তবে তার চোখ ভর্তি পানি। অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য।

জহির খাঁ গলা নিচু করে বললেন, ডাক্তার শোন, আজ আমি ইমাম সাহেবরে দেখলাম। আচকান পাঞ্জাবি পরা। মাথায় টুপী।

আনিস কিছু বলল না।

জহির খাঁ বললেন, ঘটনাটা বলার আগে তোমার কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। এই যে আজিজ মিয়া পানিতে ডুইব্যা মারা গেছে— এই বিষয়ে তোমার অনুমান কী ? কেন মরল ?

আপনাকে আগেই বলেছি— আমার অনুমান শক্তি দুর্বল।

জহির খাঁ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অনেকেই মনে করবে কাজটা আমি করায়েছি। ভয় দেখায়ে তারে পানিতে নিয়া ফেলছি— ঘটনা সত্য না। আমি মানুষরে শাস্তি দেই। সেই শাস্তির মাপ আছে। কানে ধরে উঠবস করাই, মাঠে চক্কর দেওনের ব্যবস্থা করি। আমার অবস্থায় থাকলে এইগুলা করতে হয়। বুঝতে পারতেছ ?

আনিস জবাব দিল না। চুপ করে রইল। তার বাসায় ফেরা উচিত। সকিনার খবর নিয়ে অতি দ্রুত নবনীর কাছে যাওয়া উচিত। কে জানে নবনীর জ্বর হয়তো আরো বেড়েছে। বড় মানুষদের কনফেসন শোনা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে এই কনফেসনটা প্রায় সময়ই ওষুধের মতো কাজ করে। সেই অর্থে জহির খাঁর কথা তার শোনা উচিত।

ডাক্তার।

জ্বি।

আমি পিশাচ না। আমি কথায় কথায় বলি— আমি দুষ্ট লোক। আমি চাই লোকে আমারে দুষ্ট লোক ভাবুক। এতে আমার কাজের সুবিধা হয়। আমি দুষ্ট লোক এইটা সত্য, তবে যতটা বলি ততটা না। আমার কথা কি তুমি মন দিয়া শুনতেছ ?

জ্বি শুনছি।

এখন শোন— আমি কী দেখলাম। রাত বাজে একটা। আমার ঘুম আসতেছে না। প্রতিরাতে আমি মদ্যপান করি। এইটা করলাম না। আমার বাড়ির পিছনে একটা লিচু গাছ আছে তুমি দেখেছ কি-না জানি না। বিরাট গাছ। গাছের তলাটা আমি বাঁধায়ে দিয়েছি। মন টন খারাপ থাকলে মাঝে মাঝে সেখানে বসি। বসে আছি— হঠাৎ দেখি ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক দিয়ে কে যেন

আসতেছে। ছোটখাট একজন মানুষ। হেলতে দুলতে আসতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চারদিকে তাকায়। তারপর হাঁটা ধরে। আমি তাকায়ে আছি— তারপর দেখি যে দিক থেকে আসছিল সে আবার সেই দিকে হাঁটা ধরেছে। কিছুক্ষণ পরে তারে আর দেখা গেল না। আমি ভাবলাম চোখের ধান্ধা। একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটে দুটা টান দিয়েছি— দেখি সে আবার আসতেছে।

আমার বুক ধ্বক করে উঠল। কারণ আমি মানুষটারে ভালোমতো চিনেছি। আমাদের ইমাম সাহেব। আমার হাতে আছে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। ডাক্তার আমি ভীতু লোক না। আবার খুব যে সাহসী তাও না। আমি টর্চ হাতে আগায়ে গেলাম। লোকটা কাছাকাছি আসলে তার মুখে টর্চ ফেলব।

আগে সে যেভাবে আসতেছিল এখনো সেভাবেই আসতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। এইদিক ঐ দিক চায় আবার হাঁটা শুরু করে। লোকটা আমার কাছাকাছি আসতেই আমি তার গায়ে টর্চ ফেললাম। যা ভেবেছিলাম— তাই। ইমাম ইয়াকুব। গাল ভর্তি দাড়ি। পরনে আচকান, পায়জামা, মাথায় টুপী। টর্চ ফেলতেই ইমাম উল্টা দিকে দৌড়াতে শুরু করল। আমি টর্চ ধরেই আছি। দেখলাম সে আসলে দৌড়াচ্ছে না— বাতাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এই হলো ঘটনা।

আপনি কি করলেন— বাড়িতে চলে এলেন?

না। আমি লিচু গাছের নিচে আবারো গিয়া বসলাম। বাড়ি থেকে দোনালা বন্দুক নিয়ে আসলাম। টোটা ভরলাম। ঠিক করলাম আবার যদি সে আসে— গুলি করব।

এসেছিল?

আর আসে নাই। রাত তিনটার সময় খবর পাইলাম দুর্ঘটনা ঘটেছে। তারপর থাইক্যা নিঃশ্বাসের কষ্ট।

এখন একটু কম না?

হ্যাঁ এখন কম।

আপনি শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। আপনার ঘুম দরকার।

ডাক্তার তোমারে কথাগুলো বলতে পেরেছি আমার হালকা লাগতেছে।

হেনা আবারো মাথা বের করেছে। জহির খাঁ ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ডাক্তার তুমি এই মেয়ের গালে ঠাশ কইরা একটা চড় মার। বড় ত্যাক্ত করতাছে। হেনা সরে গেল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

ইমাম সাহেবের চালা ঘরে বাতি জ্বলছে। আনিস সাইকেলের বেল টিপতেই সকিনা বের হয়ে এল। তার মাথা কালো চাদরে ঢাকা। চাদরের ফাঁক দিয়ে মুখ বের হয়ে আছে। সেই মুখ ভয়ে ছোট হয়ে আছে।

আনিস বলল, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম...

মেয়েটি আনিসকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আমি আপনেরে চিনি। বাপজান আপনার কথা আমাকে চিঠিতে লিখেছেন।

আপনি একা একা ভয় পাচ্ছেন কি-না দেখতে এসেছি।

সকিনা বলল, আমার ভয় কম। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি। আমি খুবই ভয় পেয়েছি। আমার বাপজান মানুষ মারতেছে এটা কেমন কথা।

আনিস বলল, এটা খুবই ভুল কথা। এটা নিয়ে আপনি মোটেই দুঃশ্চিন্তা করবেন না। আপনি বরং এক কাজ করুন— আমার বাসায় চলুন। আমার স্ত্রী আছে। আপনার থাকতে সমস্যা হবে না। আমার স্ত্রী কাল সকালে ঢাকা চলে যাবে। আমার মনে হয় আপনারও চলে যাওয়া ভালো।

বাপজানরে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাব? বাপজানের মৃত্যুর কোনো বিচার হবে না?

আনিস কী বলবে বুঝতে পারল না। সকিনা বলল, সবাই আপনাকে খুব ভালো পায়। আমার বাপজান চিঠিতে লিখেছিলেন আপনি ফিরিশতার মতো মানুষ। আপনি যদি আমাকে চলে যেতে বলেন আমি চলে যাব।

আনিস বলল, আমি আপনাকে চলে যেতেই বলছি। কারো ওপর কোনো রাগ না রেখে আপনি চলে যান।

সকিনা বলল, আচ্ছা আমি চলে যাব। তবে রাতটা এখানেই থাকব।

ভয় পাবেন না?

না, ভয় পাব না। জহির উদ্দিন খাঁ সাহেব আমার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। তার হুকুম মতো আমার সঙ্গে একজন মহিলা থাকেন। মসজিদে একজন পুরুষ মানুষ থাকে।

তাই না-কি?

তিনি এই কাজটা প্রথম দিন থেকেই আমার জন্যে করেছেন। কেন করেছেন তা আমি জানি না। দুই বেলা আমার জন্যে তিনি ভাত তরকারি পাঠান। একটা কথা আছে না— গরু মেরে জুতা দান। আমার মনে হয়

ব্যাপারটা সে রকম।

আনিস বলল, সে রকম তো নাও হতে পারে। হয়তো যে কাজটা উনি করেছেন তার জন্যে তিনি অনুতপ্ত। হয়তো আপনাকে দেখে তার মায়া লেগেছে। আমার ধারণা লোকে উনাকে যতটা খারাপ ভাবে তত খারাপ উনি না।

সকিনা কঠিন গলায় বলল, আমার বাবাই শুধু খারাপ। খারাপ কাজ করে সে শাস্তি পেয়েছে। মৃত্যুর পরেও খারাপ কাজ করছে। মানুষ মারছে। কিছু মনে করবেন না ডাক্তার সাহেব মনের দুঃখে কিছু কঠিন কথা বললাম।

আমি কিছু মনে করি নি।

সকিনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি হাসান নামের লোকটার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু কথা বলতে পারলাম না। জহির খাঁ সাহেব হাসানকে আর তার ছেলেকে দূরে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি চান না আমি তার সঙ্গে কথা বলি।

আনিস বলল, পুরনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার দরকার কী?

সকিনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন ঘটনা সত্যি?

আনিস বলল, আমি কিছু বিশ্বাস করি না। আবার কোনো কিছু অবিশ্বাসও করি না। আমি শুধু একটা জিনিসই জানি— প্রাণী হিসেবে মানুষ খুবই অদ্ভুত। কোনো প্রাণীই তার স্বজাতিকে হত্যা করে না। শুধু মানুষ করে।

মাটির হাঁড়ির মুখ কলাপাতা দিয়ে বাঁধা।

বাঁধন খুলতে খুলতে মরজিনার চোখ চকচক করতে লাগল। সে আদুরে গলায় বলল, আইজ আবার কী আনছেন?

মতি উদাস গলায় বলল, জানি না কী আনছি। খুইল্যা দেখ।

জিনিসটা কী চিনতেছি না তো।

মুখে দিয়া দেখ।

মরজিনা বলল, দেখতে জানি কেমন। ঘিন্না ঘিন্না লাগতেছে।

ঘিন্না লাগলে খাইও না। সবেরে সব জিনিস সয়না। ঘি খাইলে কুত্তার লোম পইড়া যায়। জিনিসটা হইল তেলিকান্দির সরভাজা।

তেলিকান্দির সরভাজা?

নাটোরের কাঁচাগুল্লা, পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই যে রকম— তেলিকান্দির সরভাজাও একই রকম। রমেশ কারিগরের সাক্ষাত নাতি ওস্তাদ পরমেশ কারিগরের নিজের হাতে পাক দেওয়া জিনিস। ঢাকা শহরের রইস আদমীরা নগদ টেকা দিয়া এই জিনিস নিয়া যায়। সাতদিন আগে অর্ডার দেওন লাগে। বহুত ঝামেলা কইরা তোমার জন্যে জোগাড় করছি। তুমি জিনিস চিনলা না, আমার আর করনের কী আছে ! এইটা হইল আমার কপাল।

মরজিনা আঙ্গুলের ডগায় খানিকটা সরভাজা মুখে দিল। মতি বলল, কেমন ?

গন্ধ ভালো না, কিন্তু খাইতে ভালো।

খাওয়াটাই আসল, গন্ধ কিছু না। গু যদি খাইতে ভালো হইত— মানুষ নাকে চাপ দিয়া সমানে গু খাইত।

মরজিনা আগ্রহ করে খাচ্ছে। মতির এই দৃশ্য দেখতে বড় ভালো লাগছে। আহারে বেচারি! ভালো মন্দ খাইতে এত পছন্দ করে সেই ভালো মন্দ খাওয়ার ব্যবস্থাই তারে আল্লাহপাক দেয় নাই।

তেলিকান্দির সরভাজা যে আসলে ওস্তাদ পরমেশ কারিগর বানায় নি, মতি নিজে বানিয়েছে— এটা বলতে ইচ্ছা করছে। মতি চায়ের দোকান থেকে তিন কাপ দুধের সর কিনে নিয়ে সোয়াবিন তেলে ভেজে ফেলেছে। সঙ্গে চার চামচ চিনি দিয়েছে। তেজপাতা ছিল না বলে দেওয়া হয় নি। কড়াই থেকে কালো রং ওঠায় জিনিসটা দেখতে বিদঘুটে হয়েছে। তাতে ক্ষতি কী ? খাওয়া হলো আসল। মতি বলল, মরজিনা মজা পাইছ ?

মরজিনা বলল, আরেকবার আনন লাগব।

মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চেষ্টা নিব। পারব কি-না বলতে পারি না। পরমেশ কারিগররা আমার মতো দুই পয়সা দামের মানুষ ক্যামনে ধরে কও দেখি।

একবার যখন ধরতে পারছেন, আরেকবার পারবেন।

দেখি চেষ্টা নিব।

মরজিনা বলল, আমারে সোনার কিছু কিন্যা দিয়েন— মেয়েছেলের শইল্যে সোনার কোনো জিনিস না থাকলে দোষ লাগে। এমন সুন্দর সোনার একটা নাকছাবি ছিল— কই যে পড়ছে!

মতি বলল, চিন্তা নিও না। দিব সোনার নাকছাবি। স্বাধীন ব্যবসায়

নামতেছি— টেকা পয়সার চিন্তা আর থাকব না।

কী ব্যবসা ?

স্বপ্নে একটা বড়ি বানানির হিসটোরি পাইছি। এই বড়ি বেচব। বড়ির নাম— জ্বরমতি। এই বড়ি দুইটা খালি পেটে খাইলে যে-কোনো জ্বর দুই ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হয়।

টেকা পয়সা হইলে কি আর আপনে আমারে পুছবেন ? আমি কে ?

আমি অবশ্যই তোমারে পুছব। ট্যাহা পয়সা হইলে তোমারে বিবাহও করতে পারি। অনেক দিন থাইক্যা সংসার করতে ইচ্ছা করে। টেকা পয়সার অভাবে সংসার করতে পারতেছি না।

আমার মতো একটা খারাপ মাইয়ারে আফনে সত্যই বিবাহ করবেন ?

অবশ্যই করব। তুমি যেমন খারাপ আমিও তেমন খারাপ। খারাপে খারাপে কাটাকাটি।

আনন্দে মরজিনার চোখে পানি এসে গেল। মতি গভীর আবেগের সঙ্গে বলল— কানবা না। দুই দিনের দুনিয়াত আসছ আনন্দ ফূর্তি কইরা যাও। আমার মন খুবই খারাপ। তোমার চউক্ষের পানি দেখলে আরো খারাপ হইব।

মন খারাপ কী জন্যে ?

ইমাম সাব আছে না সে আইজ একটা লোক মাইরা ফেলছে।

কী কন আপনে ?

খুবই খারাপ অবস্থা। আর গেরামে যাব না বলে ঠিক করেছি।

থাকবেন কই ?

তোমার এইখানে থাকব। স্বামীরে তো তুমি ফেলতে পারবা না। না-কি ফেলবা ?

স্বামী আবার কখন হইলেন!

এখনো হই নাই— একদিন তো হইব। হইব না ?

মরজিনা হাসছে। লাজুক হাসি। মতির দেখতে বড় ভালো লাগছে। না, সংসার ধর্মটা করা দরকার। শুধু যদি বড়িগুলা আস্ত থাকত। পাউডার হয়ে না যেত। সংসার ধর্মের আগে বড়ি ঠিক করতে হবে। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়। বড় বুদ্ধি এই মেয়ের। বুদ্ধিতে ঝকঝক করতেছে। সেই তুলনায় মরজিনার বুদ্ধি— গরু ছাগলের চেয়ে সামান্য বেশি। তাও খুব বেশি

না। দুই আঙ্গুল বেশি। অন্তরে মায়া মুহব্বত নাই। ভালো ভালো খাওন যদি কেউ দেয় তার জন্য মায়া মুহব্বত আছে। খাওন নাই, মায়া মুহব্বতও নাই। আজিব মেয়ে মানুষ। সব মেয়ে মানুষই আজিব— মরজিনা একটু বেশি আজিব। আল্লাপাকের দুনিয়াটাই আজিব।

মরজিনা বলল, কী চিন্তা করেন ?

আল্লাপাকের আজিব দুনিয়া নিয়া চিন্তা করি।

মরজিনা বলল, একটা জিনিস খাইতে খুব মনে চায়— গরম বুন্দিয়া। লুচি দিয়া বুন্দিয়া। মতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল— কী মেয়েছেলে, কোনো ভালো চিন্তা নাই। তার চিন্তা— গরম বুন্দিয়া। এমন মেয়েছেলে নিয়ে সংসার করা কঠিন হবে। খুবই কঠিন। ভাবের কথা বললে কিছুই বুঝবে না। মতির মাঝেমধ্যে ভাবের কথা বলতে ভালো লাগে। লুচি-বুন্দিয়া নিয়া কতক্ষণ আর কথা বলা যায় ? মতি বড়ই উদাস বোধ করল।



আনিসের ঘরের বারান্দায় ঝুলানো চারটা অর্কিড গাছেই ফুল ফুটেছে। নীল ফুল। লম্বা বড় বড় সতেজ অহংকারি পাপড়ি। আনিস মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। স্বপ্নে অর্কিড গাছে ফুল ফুটতে সে দেখেছে। স্বপ্নের ফুল থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছিল। বাস্তবের ফুলগুলি থেকে আলো ঠিকরে বের হচ্ছে না, কিন্তু দেখতে স্বপ্নের ফুলের চেয়েও সুন্দর লাগছে। আনিস ঠিক করল— অর্কিড গাছে ফুল ফোটার খবরটা নবনীকে জানাবে। কয়েক লাইনের চিঠি— তুমি যে অর্কিডগুলি দিয়েছিলে সেখানে ফুল ফুটেছে। এই সঙ্গে গাছের কিছু ছবি।

নবনী ক্যামেরার জন্যে ফিল্ম নিয়ে এসেছিল, ব্যবহার করা হয় নি। এখন ব্যবহার করা যাবে। ফিল্ম নেত্রকোনা পাঠিয়ে ডেভেলপ করে আনাতেও দু'দিন লাগবে। বিরাটনগরের কিছু ছবিও সে তুলে নিয়ে যাবে। শ্মশানঘাটের ছবি, বুধবারে যে হাট বসে— হাটের ছবি, আড়ং-এর ছবি।

বিরাটনগরে থাকার কাল শেষ হয়েছে। ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পিএইচডি করার স্কলারশিপ পাওয়া গেছে। গবেষণার কাজটা তার কেমন লাগবে সে বুঝতে পারছে না। ডাক্তারি করে যে আনন্দ সে পেয়েছে সেই আনন্দ কি পাবে? মনে হয় পাবে না। মানুষের ভালোবাসায় যে অভ্যস্ত হয়ে যায় সেই ভালোবাসা না পেলে সে অথৈ জলে পড়ে যায়।

আনিসকে দেখিয়ে কেউ যখন গর্ব এবং অহংকার নিয়ে বলে— আমরার সাইকেল ডাক্তার যায়। বাক্কা বেডার চাক্কাডা— তখন মনে হয় কড়া কোনো নেশার বস্তু রক্তে ঢুকে গেছে। শরীর ঝনঝন করতে থাকে।

বুধবার হাটে আনিস মাছ কিনতে গিয়েছিল। দশটা কইমাছ কিনে দাম দিতে গেল— মাছওয়ালা এমনভাবে তাকাল যেন সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে। হড়বড় করে বলল— আমি গরিব বইল্যা এই অপমান— আপনে আমারে দাম দিতে চান। কপালের দোষে গরিব হইছি ডাক্তার সাব। আইজ যদি আপনের কাছে মাছের দাম নেই আর এই সংবাদ আমার পরিবারের কানে

যায়— হে আমারে তিন তালাক দিয়া বাপের বাড়ি চইল্যা যাবে।

আনিস হাসতে হাসতে বলল, কারণ কী?

কারণ আফনে তারে বাঁচাইছিলেন। আমরা তার জীবনের আশা ছাইড়া দিয়া মৌলবি ডাকাইয়া তওবা পর্যন্ত পড়াইছি।

মানুষের ভালোবাসার বন্ধন কাটানো খুবই কঠিন। কঠিন হলেও বন্ধন কাটাতে হবে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। আনিস সাইকেল নিয়ে পথে নামল। সাইকেলের কেরিয়ারে ডাক্তারি ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগের এক কোনায় আছে একটা ক্যামেরা। ছবি তোলা হবে।

মসজিদের কাছে এসে আনিস সাইকেল থেকে নামল। মসজিদের নতুন ইমাম সাহেব বের হয়ে এলেন। খুবই অল্পবয়স্ক, হাসি খুশি একজন যুবক। সুন্দর চেহারা।

আনিস বলল, ইমাম সাহেব কেমন আছেন?

ইমাম বিনয়ের সঙ্গে বলল, ভালো আছি ডাক্তার সাহেব।

আনিস বলল, একা একা থাকেন। ভয় লাগে না?

ইমাম বলল, জ্বি না ভয় লাগে না। আল্লাহপাকের পাক কালাম পড়ে রাতে ঘুমাই— ভয় লাগবে কী জন্যে!

নতুন এই ইমামকে আনিসের খুব পছন্দ। ছেলেটা হাদিস কোরানের বইপত্র ঘেঁটে সবাইকে দেখিয়েছে, অপঘাতে যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্যেও জানাজার নামাজ হবে। সে আগের ইমাম সাহেবের জন্যে জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করেছে। আনিস সকিনাকে চিঠি লিখে ঘটনাটা জানিয়েছে। আনিস লিখেছে—

> আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে আপনার বাবার জন্যে জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদের নতুন ইমাম সাহেব ব্যবস্থা করেছেন। এবং প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। বিরাট নগর গ্রাম ছাড়াও আশেপাশের গ্রামের মানুষরা জানাজায় শরিক হয়েছে। জানাজার পর মিলাদ হয়েছে। চেয়ারম্যান জহির খাঁ সাহেব মিলাদ উপলক্ষে দু'টা গরু জবেহ করে লোকজনদের খাইয়েছেন।
>
> আপনার শুনে খুবই ভালো লাগবে যে জহির খাঁ সাহেব মিলাদের অনুষ্ঠানে বলেছেন— 'তিনি অন্যায় করেছেন। একজন সম্মানিত মানুষকে অপমান করেছেন।'

> জহির খাঁ সাহেবের শরীর ভালো না। আপনি দয়া করে তার ওপর কোনো রাগ রাখবেন না।

ক্লিনিকের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আনিস কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। তার নিজের শরীরও ভালো যাচ্ছে না। অল্পতেই ক্লান্তি লাগে। এই ক্লান্তি মনের না শরীরের তাও সে বুঝতে পারছে না। জটিল কোনো ব্যাধি কি শরীরে ঢুকে পড়েছে। যে ব্যাধিকে সে নিজে সাইকেলে ঘণ্টা বাজিয়ে দূর করতে পারবে না। প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে নানান খেলা খেলে। প্রকৃতি হঠাৎ যদি চায় ...

আনিস ঘুমিয়ে পড়ল। তার দুপুরের খাওয়া হলো না। সুজাত মিয়া রান্না করে বসে রইল। মানুষটা না খেয়ে ঘুমাচ্ছে— সে কী করে খায়। সুজাতের পায়ে চকচকে নতুন জুতা। এই জুতা আনিস অর্ডার দিয়ে ঢাকা থেকে বানিয়েছে। জুতার হিল একটা বড়, একটা ছোট। এই জুতা পরে সুজাত অন্য সবার মতো সাধারণভাবে হাঁটতে পারে। পায়ে জুতা পরা অবস্থায় তার হাঁটা দেখে কেউ বলতেই পারবে না তার পায়ে কোনো সমস্যা আছে। জুতা পরে হাঁটতে তার খুবই লজ্জা লাগে। সে হলো ফকিরের বাচ্চা, কিন্তু পায়ে চকচকা জুতা। আবার এই জুতা পরে হাঁটতেও তার ভালো লাগে। একদিন জুতা পরে সে একটা দৌড় দিয়েছিল। কোনো সমস্যা হয় নি।

সুজাত শুনেছে আনিস চলে যাবে। সুজাত এই নিয়ে কিছু বলে নি। তবে সে ঠিক করে রেখেছে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সেও যাবে। বিলাত, লন্ডন, যেখানেই হোক যাবে। বিরাটনগর ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। ডাক্তার সাহেব যদি তাকে নিতে না চান তাহলে সে এই জুতা জোড়া পরবে না। মগড়া নদীতে ভাসিয়ে দেবে। এটা তার মুখের কথা না, সে জুম্মা ঘর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে।

দুপুরের ডাকে আনিস দু'টা চিঠি পেয়েছে। একটা তার মা লিখেছেন, আরেকটা নবনী। মা'র চিঠিটা আনিস বিছানা থেকে না নেমে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলল। মা লিখেছেন—

> বাবা তুমি পিএইচডি করতে বাইরে যাচ্ছ শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তোমার বাবা তার স্বভাবমতো এটা নিয়েও নানাবিধ যন্ত্রণা করছেন— তুমি আমেরিকার যে স্টেটে যাচ্ছ তার আবহাওয়া এবং তার জলবায়ু নিয়ে বইপত্র এনে নানান ধরনের গবেষণা শুরু করেছেন এবং তিনি তার জ্ঞানের নমুনা আমাকে দেখাতে শুরু করেছেন। রাত তিনটার সময় কেউ যদি আমারে ঘুম থেকে ডেকে তুলে

বলে— মেরিল্যান্ডে ডিসেম্বর মাসেও বরফ পড়ে না। গত বছর ক্রিসমাসের সময়ও বরফ পড়ে নি। তখন কেমন লাগে তুমিই বলো। এই নিয়ে আমি দু' একটা কঠিন কথা বলেছি— তার ফলে তোমার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। এখন তিনি আছেন উত্তরায় তার খালাতো ভাই পারভেজ সাহেবের বাসায়। সেখান থেকে নিয়ম করে প্রতিদিন টেলিফোনে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। যতই বয়স বাড়ছে ততই তোমার বাবা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছেন। শুনেছি তুমি খুব ভালো ডাক্তার হয়েছ— তোমার বাবার জন্যে অবশ্যই ওষুধের ব্যবস্থা করবে।

আনিস হো হো করে হাসছে। সুজাত ঘরে ঢুকে বলল, ভাত খাইবেন না?

আনিস বলল, অবেলায় আর ভাত খাব না। শরীরটা ভালো লাগছে না। এক কাপ চা খাব। আচ্ছা শোন চাও খাব না।

সুজাত শুকনা মুখে তাকিয়ে আছে। তার প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। কিন্তু সে ডাক্তার সাহেবকে ফেলে খাবে কীভাবে?

নবনীর চিঠিটা পড়তে আনিসের ভয় ভয় লাগছে। চিঠিতে কী লেখা আছে আনিস তা অনুমান করতে পারে— তারপরেও চিঠি পড়ার মতো সাহস সে সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না। আনিস বিছানা ছেড়ে উঠল। শরীরের অসুস্থতাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। সাইকেলে করে সে খানিকটা ঘুরবে— তারপর যাবে শ্মশানঘাটায়। নবনীর সব চিঠিই সে শ্মশানঘাটের নির্জনতায় পড়েছে। আজকেরটা বাদ যাবে কেন? হোক না কঠিন কোনো চিঠি।

আনিস শ্মশানঘাটে গিয়ে খানিকটা চমকাল। কেউ একজন শ্মশানঘাটা ঝকঝক করে রাখছে। এই কাজটা যে আজই প্রথম করা হচ্ছে তা-না। রোজই করা হচ্ছে। কাজটা কেউ একজন আনিসকে খুশি করার জন্যে করছে তা বোঝা যাচ্ছে। যে কাজটা করছে সে ঘটনাটা প্রকাশ করছে না। নবনী থাকলে চট করে বের করে ফেলত। এসব ব্যাপারে তার অসম্ভব বুদ্ধি। আনিস নবনীর চিঠি পড়তে শুরু করল।

ডাক্তার সাহেব,

কেমন আছ বল তো? শুনে খুশি হবে কি-না জানি না,

আমার দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়েছে। কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে ঢাকায় এসে দুঃস্বপ্নহীন রাত কাটাচ্ছি। স্বপ্ন-খাতাটা কুটিকুটি করে ফেলে দিয়েছি।

আমার চিঠি পড়ে কি কষ্ট পাচ্ছ? প্লীজ কষ্ট পেও না। দুঃস্বপ্ন নিয়েও যদি তোমার গলায় ঝুলে থাকতাম তাহলে কষ্টটা অনেক বেশি হতো। এখন অনেক কমের ওপর দিয়ে গেল। আমার সিদ্ধান্ত তোমার মা-কে জানাতে গিয়েছিলাম— তিনি তোমার বিদেশ যাত্রা নিয়ে এতই আনন্দিত যে কথাটা বলা গেল না। বিদেশ যাবার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি একটু চিন্তা কর তো। আমার ধারণা গ্রামে ডাক্তারির ব্যাপারটায় তুমি যতটা আনন্দ পাচ্ছ— বিদেশের ল্যাবোরেটরিতে তত আনন্দ পাবে না। তোমাকে 'সাইকেল ডাক্তার' হিসেবে যতটা মানায়— মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুগম্ভীর অধ্যাপক হিসেবে তত মানায় না।

তোমাদের মতি আমার কাছে গোপনে একটা পরামর্শ চেয়েছে— সে না-কি স্বপ্নে পাওয়া কি ট্যাবলেট বানাতে চাচ্ছে। ট্যাবলেট জোড়া লাগছে না। জোড়া কীভাবে লাগে জানতে চেয়েছে। তাকে বল আগার আগার গাম ব্যবহার করতে। আমি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিয়েই বলছি। আগার আগার গাম পানিতে গুলে বড়ির সঙ্গে মেশাতে হবে।

তোমাদের মতি যে ইমাম সাহেব সেজে বিভিন্ন মানুষকে ভয় দেখাতো এটা জান? মহিলা শার্লক হোমসের মতো আমি রহস্যভেদ করেছি। কীভাবে করলাম বলি— আমি লক্ষ করলাম মতির হাইট এবং ইমাম সাহেবের হাইট একই। দু'জনই রোগাপাতলা ছোটখাট মানুষ। তখন আমার সন্দেহ হলো মতি বোধহয় ইমাম সাহেবের আচকান টুপি চুরি করে এই কাজটা করছে। আমি মতিকে হুট করে জিজ্ঞেস করলাম, মতি ইমাম সাহেবের আচকান টুপি চুরি করেছ কেন? মতি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। তখন বললাম, মানুষকে ভয় দেখাও কেন? মানুষকে ভয় দেখানো কি উচিত? মতি খুবই বিব্রত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাতে লাগল।

দেখেছ আমার কত বুদ্ধি ?

তোমাদের চেয়ারম্যান জহির খাঁ সাহেবের কথায় বিভ্রান্ত হয়ো না। তিনি অত্যন্ত চালাক মানুষ। তার চালাকির সঙ্গে তুমি পারবে না। তুমি তো জান না যে তার স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল। ভদ্রমহিলা কলেরায় মারা গেছেন এই ঘোষণা দিয়ে তিনি অতি দ্রুত তার স্ত্রীর কবরের ব্যবস্থা করেন। এই লোককে চট করে বিশ্বাস করা কি উচিত ?

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে অতি দ্রুত তিনি তোমাকে কোনো বিপদে ফেলবেন। কারণ তিনি তার আশেপাশে ক্ষমতাবান মানুষ পছন্দ করেন না। তুমি কাকতালীয়ভাবে এই অঞ্চলের একজন ক্ষমতাধর মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছ। তুমি মানুষটা বোকা বলেই আমার ভয়।

বোকা বলছি বলে রাগ করছ না তো ? তুমি বোকা তো বটেই, বোকা বলেই আমি যখন বলেছি তোমাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি— তুমি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলেছ। মানুষকে এত বিশ্বাস করাও কিন্তু ঠিক না।

আমি ঢাকায় আসার সময় ট্রেনে উঠেছি— দেখলাম তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে আছ। একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছ না। আমি প্রথম ভাবলাম রাগ করে তাকাচ্ছ না। তারপর হঠাৎ দেখি তোমার চোখ ভর্তি পানি। আমার কী যে আনন্দ হলো। তখন ভাবলাম, কিছুদিন তোমাকে কষ্ট দিয়ে দেখি। আনন্দকে তীব্র করার জন্যে কষ্টের প্রয়োজন আছে, তাই না ?

আমার অর্কিড গাছগুলোতে ফুল ফুটলেই আমাকে খবর দেবে। আমি চলে আসব।

ডাক্তার সাহেব, তুমি আমার জন্যে দু'ফোটা চোখের জল ফেলেছ— তার প্রতিদানে আমি "জনম জনম কাঁদিব।"

চিঠি শেষ করে আনিস স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এক সময় সন্ধ্যা মিলাল, রাত হলো। অন্ধকার রাত— তারপরেও আনিসের মনে হলো— অপূর্ব জোছনা হয়েছে। জোছনার তীব্র আলো শ্বেতপাথরে চকমক করছে। জোছনা গায়ে মাখার জন্যে কি-না কে জানে ডাক্তারি ব্যাগ মাথার নিচে দিয়ে আনিস লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে মতি অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছে। শ্মশানঘাট সেই ধুয়ে পরিষ্কার করে। শ্মশানঘাটায় এসে এই পাগল ডাক্তার যা করে তাই তার দেখতে ভালো লাগে। তার কাছে মনে হয় রহস্যে ভরা এই মানব জীবনটাকে লোকে যত খারাপ বলে— আসলে তত খারাপ না।

মতির কাছে মনে হলো ডাক্তার শুধু যে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে তা না, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মতি মনে মনে বলল, আহারে আহারে!
